

SP-2023

(1)a) Meaning of (al-ma'roof):

উত্তম (মা'রুফ) অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে হয়েছে

আল্লাহ ও তাঁর নবী কর্তৃক নির্দেশিত। এর মধ্যে রয়েছে: আল্লাহর প্রতি পরম আন্তরিকতা (ইখলাস), আল্লাহর উপর নির্ভরতা (তাওয়াক্কল), যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশি মুমিনের কাছে অন্য কারো চেয়ে প্রিয়, আল্লাহর রহমতের আশা এবং তাঁর ভয় শাস্তি, আল্লাহর হুকুমের প্রতি ধৈর্য এবং তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ আদেশ, কথার সত্যতা, বাধ্যবাধকতা পূরণ, আমানত তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া মালিক, পিতামাতার প্রতি ভাল আচরণ, পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখা, সহযোগিতা ধার্মিকতা এবং ভাল, দানশীলতা এবং একজনের প্রতি উদারতার সমস্ত কাজে প্রতিবেশী, এতিম, দরিদ্র মানুষ, আটকা পড়া পথিক, সঙ্গী, পল্লী এবং বান্দা, ন্যায়বিচার এবং কথা ও কর্মে ন্যায়পরায়ণতা, মানুষকে ভালোর দিকে আহ্বান করে চরিত্র, এবং সহনশীলতার কাজ যেমন তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন যারা তোমাকে কেটে ফেলেছে, যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তাদের দেয় এবং যারা জুলুম করে তাদের ক্ষমা করে আপনি. মানুষকে একত্রে ঘনিষ্ঠ হতে এবং সহযোগিতা করার আদেশ দেওয়া এবং নিষেধ করা তাদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং নিজেদেরকে বিভক্ত করাও ন্যায়ের আদেশের একটি অংশ।

(2) Meaning of (al-munkar):

যেমন খারাপ (মুনকার) যা আল্লাহ ও তাঁর নবী হারাম করেছেন, তার চূড়ান্ত ও নিকৃষ্ট রূপ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা। সংঘবদ্ধতা মানে আল্লাহর সাথে কাউকে বা অন্য কিছুকে কাছে প্রার্থনা করা। এই অংশীদার হতে পারে সূর্য, চাঁদ, তারা বা গ্রহ, একজন ফেরেশতা, একজন নবী, একজন ধার্মিক মানুষ বা সাধু, জিনদের একজন, ছবি অথবা এগুলোর কোনটির কবর বা অন্য কোন কিছু যাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে ডাকা হয় শ্রেষ্ঠ অ্যাসোসিয়েশনিজম হল উপরের যে কোনোটির কাছ থেকে সাহায্য বা সাহায্য চাওয়া, বা করা তাদের সেজদা করুন। এই সব এবং এর মত যেকোন কিছু হল মেলামেশা (শিরক) উপর আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ তাঁর সমস্ত নবীদের ভাষা। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাও মুনকারের অংশ যেমন অন্যায়ভাবে হত্যা করা, মানুষের সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া বেআইনী উপায়, বলপ্রয়োগ বা ভয় দেখিয়ে সম্পত্তি হস্তগত করা, সুদ বা জুয়া, সকল প্রকার বিক্রয় বা চুক্তি যা নবীজী নিষিদ্ধ করেছেন, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করা, পিতামাতার প্রতি নির্ভরতা, ওজন ও পরিমাপে প্রতারণা, এবং কোন ফর্ম অন্যের অধিকার লঙ্ঘনের। এছাড়াও এই বিভাগে সব উদ্ভাবিত হয় "ইবাদত" এর কাজ যা আল্লাহ ও তাঁর নবী বা আদেশ দেননি।

Significance of enjoining the good and forbidding evil:

সং কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করা , যেমন কুরআন ও হাদীসে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই অভিব্যক্তিটি হিসবাহ-এর ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি - ইসলামী আইন হস্তক্ষেপ এবং প্রয়োগ করা ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক কর্তব্য (আইনের ইসলামিক স্কুলের উপর নির্ভর করে)। এটি সমস্ত মুসলমানদের জন্য ইসলামী মতবাদের একটি কেন্দ্রীয় অংশ গঠন করে। বারোটি শিয়া ইসলামের দশটি আনুষ্ঠানিক বা বাধ্যবাধকতামূলক আইনের মধ্যে দুটি আদেশও রয়েছে।[3][4][5][6]

প্রাক-আধুনিক ইসলামী সাহিত্যে ধার্মিক মুসলমানদের (সাধারণত পণ্ডিতরা) নিষিদ্ধ বস্তু, বিশেষ করে মদ এবং বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করে অন্যায়কে হারাম করার পদক্ষেপ নেওয়ার বর্ণনা দেয়। সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বে, ইরান, সৌদি আরব, [৮] নাইজেরিয়া, সুদান, মালয়েশিয়া, ইত্যাদিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র বা প্যারাস্ট্যাটাল সংস্থা (প্রায়ই তাদের শিরোনামে "প্রমোশন অফ ভার্টু অ্যান্ড দ্য প্রিভেনশন অফ ভাইস" এর মতো বাক্যাংশ সহ) আবির্ভূত হয়েছে। , বিভিন্ন সময়ে এবং ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের সাথে, [৯] পাপমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং পুণ্যবানদের বাধ্য করা।

এটি মুসলমানদেরকে কল্যাণে সহযোগিতা করতে, একে অপরকে উপদেশ দিতে, আল্লাহর পথে লড়াই করতে, সমস্ত ভাল কাজ করতে এবং সমস্ত মন্দ থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে। মুসলমানরা যখন ভালোর নির্দেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা বন্ধ করে দেয়, তখন ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেয়, মন্দ কাজগুলো ছড়িয়ে পড়ে, উম্মাহ বিভেদ সৃষ্টি করে এবং হৃদয় কঠিন বা মৃত হয়ে যায়। ন্যায়ের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায়কে নিষেধ করা ইসলামের সবচেয়ে বড় কর্তব্য বা প্রশংসনীয় কাজগুলির মধ্যে একটি, এটা অপরিহার্য যে এর উপকারিতা এর নেতিবাচক পরিণতির চেয়ে বেশি। এটি নবীদের বাণী এবং নাযিলকৃত কিতাবের সাধারণ স্পিরিট এবং আল্লাহ বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা সবই উপকারী এবং উপকারের প্রতীক। আল্লাহ "সালাহ" (দুর্নীতির বিপরীত) এবং "মুসলিহীন" (সংস্কারক, বা যারা সালাহ নিয়ে আসে) প্রশংসা করেছেন। এবং যারা ঈমান আনে এবং সংকাজ করে (সালিহাত) তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন, পাশাপাশি কোরানের অনেক জায়গায় দুর্নীতি (ফসাদ) এবং যারা তা ঘটায় তাদের নিন্দা করেছেন। সুতরাং যখনই আদেশ বা নিষেধের কোনো কাজের প্রতিকূল প্রভাব (মাফসাদ) তার উপকারের (মাসলাহার) চেয়ে বেশি হয়, তখন তা আর আল্লাহ আমাদের জন্য যা আদেশ করেছেন তার অংশ নয়, এমনকি যদি তা বাধ্যবাধকতা অবহেলা বা নিষেধ করার ক্ষেত্রেও হয়। . এর কারণ হল, বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা ঈমানদারের উপর, এবং তাদের হেদায়েতের দায়িত্ব তার নয়। এটি সেই আয়াতের অর্থের অংশ যেখানে আল্লাহ বলেছেন:

[হে ঈমানদারগণ, তোমাদেরই দায়িত্ব তোমাদের, যারা পথভ্রষ্ট তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না যখন তোমরা হেদায়েতের উপর অটল থাকবে।]

"নির্দেশে লেগে থাকা" শুধুমাত্র সমস্ত বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং বহন করে সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং, একজন মুসলমান যখন তার উপর ফরজ কাজটি করে সংকাজের নির্দেশ এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে, যেমন সে অন্যান্য সকল ফরজ পালন করেছে, তখন বিপথগামীদের পথদ্রষ্ট হওয়া তার কোন ক্ষতি করবে না।

2) Good health:

একজন ব্যক্তিকে সুস্থ বলা হয় যখন সে মানসিকভাবে সুখী এবং সুস্থ থাকে এবং যখন তার/তার সামাজিক সম্পর্ক সমাজে সুস্থ থাকে তখন সে যেকোন ধরনের রোগ (সংক্রামক/ঘাটতি) থেকে মুক্ত থাকে।

ইসলাম স্বাস্থ্যকে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে সম্মানিত করেছে, যা এটিকে নির্দেশনা ও তথ্যের একটি শক্তিশালী উৎস করে তোলে। তার জন্মের পর থেকে, ইসলাম স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, এটিকে বিশ্বাসের গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছে।

কুরআন চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বই নয়, তবে এতে এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে যা স্বাস্থ্য ও রোগের দিকনির্দেশনা দেয়। নবী মোহাম্মদ (সাঃ) মানবজাতির জন্য একটি উদাহরণ হিসাবে প্রেরিত হয়েছে তাই স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তাঁর ঐতিহ্যগুলিও তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি গাইড।

আমরা নিম্নলিখিত আয়াত দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করি:

"তোমার (হে মানুষ) যা কিছু ভালো হয় সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে, তোমার সাথে যা কিছু খারাপ হয় তা তোমার নিজের কাজ থেকে।" (কুরআন 4:79)।

তাই, বিখ্যাত প্যাথলজিস্ট উইলিয়াম বয়েড দ্বারা প্যাথলজি (রোগ) সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ফিজিওলজি (প্রাকৃতিক অবস্থা) ভুল হয়ে গেছে। এটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের হস্তক্ষেপ যা অপ্রাকৃতিক ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়।

মানবদেহকে মানুষের তৈরি একটি যন্ত্রের সাথে কিছু মাত্রার তুলনা করা যেতে পারে।

আকর্ষণীয় টেপ রেকর্ডারটিতে অনেক যান্ত্রিক এবং ইলেকট্রনিক অংশ রয়েছে তবে একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ না আসা পর্যন্ত এতে জীবন আসে না।

একইভাবে, মানবদেহের উপাদানগুলিতে শারীরবৃত্তীয় অংশ এবং তরল রয়েছে তবে আত্মা (আত্মা)ও রয়েছে। একটি যন্ত্রের যন্ত্রের জন্য এটিকে পরিষ্কার রাখা, কিছুটা বিশ্রাম দেওয়া এবং সঠিক ভোল্টেজের বিদ্যুৎ পাস করা এবং এটিকে সাবধানে এবং বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন, তাই শরীরের এবং পুরো শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

মানবদেহের শারীরিক পরিচর্যা আসার আগে আধ্যাত্মিক পরিচর্যার কথা বলি।

আধ্যাত্মিক যন্ত্র উপাসনা কর্ম জড়িত. সমস্যা হল ইমান (ঈমান) কে বিশ্বাসে অনুবাদ করা যায় না, নামাযকে নামাযে, না ওয়ুকে হাত, মুখ-পা ধোয়াতে বা না; রোজায় সাওম, যাকাত দান-খয়রাত বা হজ মক্কায় হচ্ছে। তারা নিজেরাই অধিকারী।

উঃ ইমানঃ

ঈশ্বরে বিশ্বাস আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে তাঁর গুণাবলী, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর বই, বিচার দিবস, স্বর্গ ও নরক এবং এই বিশ্বাস যে- ভালো-মন্দ সবই তাঁর নাগালের মধ্যে।

ইমাম রুমি ঈমানকে নামাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অসুস্থতায় ইমাম গাজ্বালীর মতে খোদার সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

সত্যিকারের বিশ্বাস ব্যতীত, আমাদের প্রার্থনা, দান, রোজা বা তীর্থযাত্রা কবুল হবে না। বিশ্বাসের সারমর্ম হ'ল আমাদের চারপাশে বা আমাদের মধ্যে থাকা সমস্ত মিথ্যা দেবতাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কাউকে উপাসনা না করা।

ডি. সাওমঃ

ইসলামিক রোজা: ইসলামিক রোজা আমাদের মন এবং শরীরকে আত্ম-সংযমের প্রশিক্ষণ হিসাবে নির্ধারিত।

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা আত্মসংযম শিখতে পার।" (কুরআন 2:183)।

অতএব, রোজার সময় একজন ব্যক্তি কেবল নিবিড় খাবার, কফি, ধূমপান থেকে মুক্তি পেতে পারে না বরং রাগ এবং অতিরিক্ত যৌন আবেগ থেকেও মুক্তি পেতে পারে।

আসলে, রোজা শুধুমাত্র পেটে বিশ্রাম দেয় না, হরমোনের নিঃসরণকেও স্থিতিশীল করে যা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ই. হজ (মক্কার তীর্থযাত্রা):

নৈতিকতা হ'ল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ, অনুশোচনার সুযোগ এবং উম্মাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাবেশ যা ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যকে চিত্রিত করে।

যাইহোক, এটি প্রোগ্রামিং এবং শারীরিক সহনশীলতার জন্য আমাদের পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, সমস্ত সক্ষম পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা। দীর্ঘ হাঁটা, তাপ, রোদ, তৃষ্ণা, শারীরিক কসরত ইত্যাদি আমাদের কেসামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বার্ধক্যের জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের উচিত তরুণ ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা অবস্থায় হজ করা। আমাদের উচিত হজের আগে ও পরে নিজেদেরকে ভালো অবস্থায় রাখা।

আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি হিসাবে বিশ্বাসের স্তম্ভগুলি বর্ণনা করার পরে, আসুন আমরা সেই শারীরিক কার্ণামোর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কথা বলি যেখানে আত্মা থাকে।

(ক) পুষ্টি:

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে এতটাই ভালোবাসেন যে আমরা যা খাই এবং আমাদের শরীরে যা রাখি তা নিয়েও তিনি চিন্তিত।

আমাদের পেশী, হাড়, ফুসফুস, লিভার, মস্তিষ্ক এবং নিঃসরণগুলি কাঁচা পণ্য থেকে তৈরি হয় যা আমরা এটি খাওয়াই। আমরা যদি কারখানায় আবর্জনা কাঁচা পণ্য সরবরাহ করি, কারখানাটি শক্ত হাড়, শক্তিশালী পেশী, ভাল পাম্প (হার্ট) এবং পরিষ্কার পাইপ (পাত্র) তৈরি করবে না।

"হে মানবজাতি: পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও উত্তম তা খাও" (কুরআন 2:168)।

আমাদের জন্য মৃত মাংস, রক্ত এবং শূকরের মাংস (কুরআন 5:3 দেখুন) এবং মাদকদ্রব্য (কুরআন 5:91, 92, এবং 2:219) নিষিদ্ধ।

বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞাগুলির কোনও উপকারী প্রভাব নিশ্চিত করেনি।\

(খ) পরিচ্ছন্নতা:

আল্লাহ পবিত্র এবং পবিত্রতা পছন্দ করেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন।

তাই কুরআনে শরীর ও মনের পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে (৪:৪৩)। মিসওয়াক (দাঁত মাজা) গত 200 বছরের নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। নবী মোহাম্মদের দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হিসাবে এটি জোর দেওয়া হয়েছিল।

তিনি আমাদেরকে ক্লসিং (খিলাল) করার পরামর্শ দিয়েছিলেন যেমনটি এখন সমস্ত দাঁতের ডাক্তারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বলেছিলেন যে এটি মুসলমানদের জন্য কষ্টকর না হলে তিনি প্রতিটি নামাজের আগে অর্থাৎ দিনে পাঁচবার মিসওয়াক করার পরামর্শ দিতেন।

আমাদের মনের পরিচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্নতার (শরীর ও মন) পূর্বশর্ত।

(গ) স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ব্যায়ামের মূল্য

যদিও আমরা কুরআনে নির্দিষ্ট ব্যায়াম, সুপারিশ সম্পর্কে অনেক কিছু খুঁজে পাই না, নবীর বাঁশি সুপারিশে পূর্ণ ছিলেন।

তিনি সকল মুসলমানকে তাদের সন্তানদের সাঁতার, তীরন্দাজ এবং ঘোড়ায় চড়া শেখানোর পরামর্শ দেন। তিনি নিজেও দ্রুত গতিতে হাটতেন, এমনকি তার স্ত্রী আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড়াতে।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি বাড়িতে, রান্নাঘরে বা তার সঙ্গীদের সাথে আগুনের জন্য কাঠ সংগ্রহ, যুদ্ধের সময় যুদ্ধ ইত্যাদিতে হাত দিয়ে কাজ করতেন।

এটি একটি দুঃখের বিষয় যে মুসলিম পুরুষ এবং মহিলারা বসে আছেন এবং স্টার্চের অত্যধিক ব্যবহারের কারণে তাদের মধ্যে স্থূলতা প্রবেশ করেছে। আমাদের উচিত নিজেদেরকে জিহাদে যাওয়ার জন্য ফিট রাখা এবং শান্তির সময়ে সুস্থ বোধ করা।

রোগের অবস্থা

অনেক সাধারণ দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা (যেমন করোনারি হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, পেপটিক আলসার ডিজিজ, স্থূলতা এবং বিষণ্ণতা) একটি সাধারণ মানবসৃষ্ট ইটিওলজি আছে, তা হল সমৃদ্ধ খাবার, অত্যধিক খাবার, অত্যধিক লবণ, অত্যধিক চিনি, ধূমপান, চাপ এবং মদ্যপান।

আমরা যদি আমাদের খাদ্য থেকে অত্যধিক লবণ, চিনি এবং কোলেস্টেরল ত্যাগ করি এবং মদ্যপান না করি এবং ধূমপান না করি এবং সক্রিয় থাকি, তাহলে পাম্প (হৃদপিণ্ড) ভিতর থেকে মরিচা ধরে না ফেলা সম্ভব।

রোগ নিশ্চিত হলে একজন মুসলমানের কী করা উচিত?

উ: তার পাপের জন্য কাফফার হিসাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে এটি গ্রহণ করুন এবং তাকে দুঃখকষ্ট দূর করতে বলুন।

"এবং যদি ঈশ্বর তোমাকে কষ্ট দিয়ে স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না: তিনি যদি তোমাকে সুখে স্পর্শ করেন তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (কুরআন 6:17)।

খ. নবীর অভ্যাস এবং শিক্ষার বিপরীতে অনেক মুসলমান প্রাথমিক চিকিৎসার খোঁজ করবে না। খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসের নিরাময়ে বিশ্বাসী একটি সম্প্রদায় রয়েছে যারা চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের সদস্যদের মরতে দিয়েছে।

3) Gambling:

ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় জুয়া খেলা আরেকটি মৌলিক নিষিদ্ধ। এটি আরবি ভাষায় মায়সির এবং কিমার নামেও পরিচিত। এটি এমন প্রতিটি কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে একজন ব্যক্তি তার সম্পত্তি জয়ী বা হারায়। অন্য কথায়, এটি একটি খাঁটি সুযোগের খেলা যেখানে একজন ব্যক্তি অন্যের খরচে জয়ী হয়।

কুরআন ও হাদিসে জুয়া খেলার নিষেধাজ্ঞা আল্লাহ (আল্লাহ) সূরা আল মায়দাতে বলেন: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, বেদী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর তীরগুলি নোংরা, শয়তান দ্বারা গঠিত। অতএব, এটি থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার" (5:90)।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং পেশাদার ক্ষেত্র। মুসলমানদের গ্রহণ এবং ইতিবাচক প্রদান নৈতিকতা এইভাবে সাবধানে নেভিগেট করে যে তাদের অনুশীলন তাদের গোলকের মধ্যে আছে কিনা শরিয়া (ইসলামী আইন) মেনে চলা। নৈতিক-আইনি কাঠামো দ্বারা চিত্রিত ইসলামের আদর্শিক উত্সগুলি বিশ্বব্যাপী অগ্রাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ খেলার সাথে মিলিত হয় সিস্টেম, এবং খেলোয়াড়দের পছন্দ। এই ধরনের কারণগুলির জন্য মুসলমানদের নেভিগেট করার প্রয়োজন হতে পারে

একাধিক নৈতিক ক্ষেত্র মধ্যে.³

ইসলামী শিক্ষাকে সাধারণত ইবাদত হিসেবে ভুল ধারণা করা হয়েছে সাধারণত জীবনের প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা। তবে প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা সমস্ত জীবনকাল এবং সব সময়ের মাধ্যমে প্রযোজ্য। এর কোনো শিক্ষা নেই বলা যেতে পারে সেকলে, এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলামী শিক্ষা প্রকৃত জীবনধারার সারমর্ম ও কর্তৃত্ব হিসেবে বিবেচিত। ৪ নবী (মে সালাম ও বরকত) বলেন।

দ্বীন হল নসীহা (উপদেশ)। সাহাবী ড

"কাকে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "প্রতি

আল্লাহ ও তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং তাঁর প্রতি

মুসলমানদের নেতা এবং তাদের সাধারণ জনগণ"

জুয়া খেলা বা 'গেম-অফ-চাম্প' ভোরের মতো পুরানো বলে মনে করা হয়

সভ্যতা এবং আইন, সামরিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়েছে

অপারেশন, অনুষ্ঠান, লিটার্জি, এবং অর্থনীতি.⁶ প্যাটনের মতে, এইগুলি

বিষয়গুলি সম্ভবত আদিম সময়ে ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল

জনগণকে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয়কভাবে উপলব্ধি করার অনুমতি দিতে। অতএব, প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল,

প্রাথমিকভাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সুযোগের পালাক্রমে কিছু অংশ বা দখলের ঝুঁকি নিয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হয়ে ওঠে।

তবে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে অপরিণত গবেষণা করা হয়েছে

জুয়া খেলার তাৎপর্য যেমন ইনফিউজিস্টদের দাবি। তবুও, প্রত্নতাত্ত্বিক

বিশ্বের উপর অনুসন্ধান, দুটোভাবে প্রস্তাব যে ধর্মীয় জুয়া উত্স, হিসাবে

infusionists দ্বারা দাবি, অকাট্য। এটি প্রধানত কারণ আঁকা নুড়ি,

ডাইস, বোর্ড গেমস, অ্যাস্ট্রাগাল এবং এই জাতীয় অন্যান্য শিল্পকর্ম সবই জুয়ার সরঞ্জাম

3500 খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকের তারিখ

অনেক প্রাক-ঐতিহাসিক সাইট খননে, এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে লোকেরা ছুঁড়ে ফেলেছে

এই হাড়গুলি 'গেমস-অফ-চাম্প'-এ এমনকি 40,000 বছর আগে পর্যন্ত।

নাসারাওয়া দক্ষিণে প্রধান ধরনের লটারি এবং জুয়া খেলা,

মাহমুদ আলী দানলামির মতে নাসারাওয়া স্টেট হল ক্যাসিনো, লটারি, বাজি

খেলাধুলায়, তাস খেলা, ইন্টারনেটে খেলা, পাশায় বাজি ধরা, দক্ষতার খেলা,

13 সহীহ আল-বুখারী, খন্ড। 7, হাদীস 4860

14 সহীহ আল-বুখারী, খন্ড। 7, হাদীস 1270

15 আল-বায়হাকী, হাদীস 1414

31 | তাহদজিব আল-আখলাক: জার্নাল পেনদিকান ইসলাম | ভলিউম 6 | নং 1 | 2023

এবং সম্প্রদায়ের ঘটনা। এই ধরনের লটারি এবং জুয়া খেলা কোন কাজ নয়

শুধু যুবকরা জড়িত, তবে এতে আসক্ত বয়স্ক ব্যক্তিরও এতে জড়িত

গবেষকদের দ্বারা লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রচুর লটারি খেলা রয়েছে

নাসারাওয়া দক্ষিণ, নাসারাওয়া রাজ্যের স্পট। এই ধরনের জুয়া খেলা

স্পোর্টস বেটিং, অনলাইন বেটিং পুল, কর্তা, ডাইস, লুডো এবং আরও অনেক কিছু থেকে পরিসর

লটারির ফর্ম যা এলাকার মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় নয়। এর মধ্যে কিছু

অ্যাক্সেস বেট, bet9ja, বেটিং, জ্যাকপটস, ব্ল্যাক-প্যাক, রুলেট, ক্র্যাপস, ভিডিও পোকার, পুল, এবং কর্তা।

দাউদা জিরিল আলাকু এর মতে, গেমিং এর আগে যারা অনেক

জুয়া এবং লটারি খেলায় নিযুক্ত থাকা প্রায়শই বাস্তব বোধ করার কথা জানায়

জুয়া তারা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখানে জুয়া খেলাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এটা

মদ্যপানকারী এবং মাদকাসক্তরা আগে যে তাগিদ অনুভব করে তার সাথে তুলনীয়

পান করা বা তাদের ঠিক করা। তারা একটি থেকে পাওয়া অর্থের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে

লটারি এবং অন্যান্য জুয়া খেলা।

তার নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র অর্থ অর্জনের জন্য জুয়া খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,

কিন্তু এটি লটারির খেলা, 'গেমস-অফ-চান্স' বা জুয়া খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

বিনোদন এবং বিনোদনের উদ্দেশ্য

সুযোগ এমনকি শিথিল করার জন্য নিষিদ্ধ, এই একই নিষেধাজ্ঞা আরো হয়ে ওঠে

অন্যের খরচে লাভ অর্জনের জন্য জুয়া খেলার ক্ষেত্রে সহজেই ধরা পড়ে।

অতঃপর, এই পদের আবেদন প্রসারিত, অতএব, এছাড়াও প্রক্রিয়া

অনুরূপ স্টক মার্কেট লেনদেন অনুরূপ রায় পাস।

এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে যে প্রজ্ঞা রয়েছে, তা যে কোনো বিস্তৃত ব্যক্তি সেখানে দেখতে পাবেন

নিম্নলিখিত সহ এর জন্য অনেক কারণ রয়েছে:

i জুয়া খেলা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত গেম একজন ব্যক্তিকে নির্ভর করে

দুর্ঘটনা, ভাগ্য, এবং তার উপার্জনের জন্য ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা, পরিবর্তে কঠিন

কাজ, তার ভ্রমের ঘাম, এবং নির্ধারিত উপায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা

আল্লাহর দ্বারা।

ii. জুয়া পরিবারকে ধ্বংস করে এবং এর মাধ্যমে সম্পদের ক্ষতি করে

হারাম মানে। এটি ধনী পরিবারগুলিকে দরিদ্র করে তোলে এবং গর্বিত আত্মাদের অপমানিত করে।

iii. জুয়া খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে শত্রুতা এবং ঘৃণা ফলাফল কারণ তারা

একে অপরের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করছে এবং সম্পদ অর্জন করছে

বেআইনিভাবে

43 ওয়াই. কারাদাউই, আল-হালালওয়া আল-হারাম ফি আল-ইসলাম (ইসলামে বৈধ ও নিষিদ্ধ)।

কে. এল-হেলবাউই, এম.

এম. সিদ্দিকী এবং এস. সিউকরি (ট্রান্স.) শোরুক ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, 1985।

জুয়া খেলা একটি | 38

iv জুয়া মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়

প্রার্থনা এবং খেলোয়াড়দের সবচেয়ে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসের দিকে ঠেলে দেয়।

v. জুয়া এবং লটারি খেলা পাপপূর্ণ শখ যা সময় নষ্ট করে এবং প্রচেষ্টা এবং মানুষকে অলসতা এবং অলসতায় অভ্যস্ত করা। এটা খামে কাজ ও উৎপাদন থেকে উন্মাহ।

vi জুয়া এবং লটারির খেলা মানুষকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়

কারণ যে অসহায় সে যেকোন কিছুতেই টাকা দখল করতে চায়

যেভাবে সে পারে, এমনকি যদি তাকে চুরি করতে হয় বা জোর করে নিয়ে যেতে হয়, বা মাধ্যমে ঘুষ গ্রহণ এবং প্রতারণা।

vii জুয়া এবং লটারি খেলা মানসিক চাপ, অসুস্থতা এবং নার্ভাস সৃষ্টি করে

ভাঙ্গন তারা ঘৃণার জন্ম দেয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপরাধের দিকে পরিচালিত করে, আত্মহত্যা, উন্মাদনা এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা

4) জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ধারক শর নিষিদ্ধ বস্তু

الشَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَتَصْنَعُكُمُ الْغُلَاظَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي

আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শর সমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে বিরত হও। তাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে’। ‘শয়তান তো কেবল চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত হ’তে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?’ (মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)।

উপরোক্ত আয়াতে প্রধান চারটি হারাম বস্তু হ’তে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সূরা মায়েদাহ কুরআনের শেষ দিকে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের অন্যতম। অতএব এখানে যে বস্তুগুলি হারাম ঘোষিত হয়েছে, সেগুলি আর মনসূখ হয়নি। ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত চিরন্তন হারাম হিসাবে গণ্য। অসংখ্য নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে এখানে প্রধান চারটির উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ চারটি হারাম বস্তু আরও বহু হারামের উৎস। অতএব এগুলি বন্ধ হ’লে অন্যগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে।

১. الْخَمْرُ অর্থ মদ। سَتَرٌ অর্থ خَمْرٌ يَخْمُرُ خَمْرًا গোপন করা। ওড়নাকে আরবীতে ‘খেমার’ (خِمَارٌ) বলা হয় এজন্য যে, তা মহিলাদের মাথা ও বুক আবৃত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْاِنْيَةُ خَمْرُوا, ‘তোমরা তোমাদের পাত্র সমূহ ঢেকে রাখ এবং তার উপরে আল্লাহর নাম স্মরণ কর’। [1] ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ‘মদ তাই, যা মানুষের বিবেককে আচ্ছন্ন করে’। [2] সে সময় আরব দেশে আগুর, খেজুর, মধু গম ও যব সহ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরী

হ'ত।[3] তবে প্রধানতঃ আপ্সুর থেকেই সচরাচর মদ তৈরী হ'ত। যেমন বলা হয়েছে, مِنْ مَاءِ الْعَنْبِ النَّيِّ - 'মদ হ'ল আপ্সুরের কাঁচা রস যখন পচে গরম হয় এবং ফুলে ফেনা ধরে যায় ও চূড়ান্ত নেশাকর অবস্থায় পৌঁছে যায়'।

২. الْمَيْسِرُ অর্থ জুয়া। يَسِرَ يَسِيرُ يَسْرًا জুয়া খেলা, অনুগত হওয়া, সহজ হওয়া, বাম দিক থেকে আসা ইত্যাদি। يَسِرُ لِي كَذَا إِذَا وَجِبَ ওয়াজিব হওয়া। الياسر أي الجازر অর্থ কসাই, গোশত বন্টনকারী।

জুয়ার যে পদ্ধতি জাহেলি যুগে প্রসিদ্ধ ছিল
জাহেলি যুগে দশ জনে সমান অংক দিয়ে একটা উট ক্রয় করতো, সেই উটের গোশত ভাগ-বাটোয়ারার জন্য জুয়ার তীর ব্যবহার করা হতো। ১০টি তীরের ৭টিতে কম-বেশি করে বিভিন্ন অংশ লেখা থাকতো এবং তিনটিতে কোনো অংশই লেখা থাকত না (এক প্রকার লটারী)। ফলে তিনজন কোনো অংশ পেত না এবং অন্য সাত জন তাদের প্রচলিত নিয়মে কম-বেশি অংশ পেত। এভাবে তারা দশ জনের টাকায় কেনা উট সাত জনে ভাগ করে নিত। বাকি তিনজন শূন্য হাতে ফিরে যেতো। (মুহাররামাতুন ইস্তাহানা বিহান্নাস, পৃষ্ঠা: ৫২)

জুয়ার বিভিন্ন ধরন ও রকম
বর্তমানে জুয়া-বাজির জন্য বিভিন্ন রকমের আসর বসে বিভিন্ন দেশে। কোথাও হাউজি আবার কোথাও সবুজ টেবিল নামে পরিচিত। ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধুলার প্রতিযোগিতায়ও বাজি ধরা হয়। প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়াও জুয়ার আরও বহু নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। যেমন- ক্লাস, পাশা, বাজি রেখে ঘোড় দৌড়, তাস খেলা, চাক্কি ঘোরানো ও রিং নিফ্ফেপ ইত্যাদি।

এগুলোর সবই হারাম। জুয়া হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শুধু নাম পরিবর্তনের কারণে বস্তু ও মূল প্রকৃতি এবং হুকুম পরিবর্তন হয় না। কাজেই প্রাচীনকালে প্রচলিত জুয়া সম্পর্কে যে হুকুম প্রযোজ্য ছিল, আধুনিককালের সব ধরনের জুয়ার ক্ষেত্রেও সেসব হুকুম সাব্যস্ত হবে।

‘ক্যাসিনো-সংস্কৃতি’ নতুন কিছু নয়
ক্যাসিনো ইতালিয়ান শব্দ। ক্যাসিনো বলতে বোঝায় যেখানে জুয়া, নাচ, গান ও বিভিন্ন খেলাধুলার সংমিশ্রণ থাকে। ১৬৩৮ সালে ইতালির ভেনিসে সর্বপ্রথম জুয়ার মাধ্যমে ক্যাসিনো ব্যবসা শুরু হয় বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা গেছে।

জুয়া সম্পর্কে বাংলাদেশের আইন
বাংলাদেশে জুয়া-বাজি ইত্যাদি নিষিদ্ধ। ১৮৬৭ সালে প্রণীত বঙ্গীয় প্রকাশ্য জুয়া আইন দেশে এখনো প্রযোজ্য। আইন অনুযায়ী, কোনো ঘর-বাড়ি, স্থান বা তাঁবু জুয়ার আসর হিসেবে ব্যবহৃত হলে তার মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী, জুয়ার ব্যবস্থাপক বা এতে কোনো সাহায্যকারী তিন মাসের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ২০০ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

এধরনের কোনো ঘরে তাস-পাশা, কাউন্টার বা যেকোনো সরঞ্জামসহ কোনো ব্যক্তিকে ক্রীড়ারত (জুয়ারত) বা উপস্থিত দেখতে পাওয়া গেলে, তিনি এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ১০০ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

পুলিশ জুয়া-সামগ্রীর খোঁজে যেকোনো সময় (বলপ্রয়োগ করে হলেও) তল্লাশি চালাতে পারবেন বলেও আইনে উল্লেখ রয়েছে। (এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানও রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘোষণা করার সময়েই এ দেশে সব রকমের রেস জুয়া বন্ধের কথা বলেছিলেন।)

ইসলাম **জুমাকে** **যেভাবে** **দেখে**
জুমাকে আরবিতে ‘আল-কিমার’ ও আল-মায়সির’ বলা হয়। এমন খেলাকে ‘আল-কিমার’ ও আল-মায়সির’ বলা হয়, যা লাভ ও ক্ষতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। অর্থাৎ যার মধ্যে লাভ বা ক্ষতি কোনোটাই স্পষ্ট নয়। ইসলামের আবির্ভাবের আগে ও নবী করিম (সা.)-এর আগমনের সময় তৎকালীন মক্কায় নানা ধরনের জুয়ার প্রচলন ছিল। তিনি সবগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন।

ইসলামে **জুয়া-বাজি** **ইত্যাদি** **স্পষ্ট** **হারাম**
জুয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, তাহলেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ আদায়ে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না। ’ (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৯০-৯১)

কোরআনে মদ ও জুমাকে ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। এগুলো থেকে দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মদ-জুয়ার মাধ্যমে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এগুলোর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে নামাজ ও আল্লাহতায়ালার স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে। মদ-জুয়া হারাম হওয়ার বিষয়টি অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই।

জুয়া **সম্পর্কে** **হাদিসে** **যা** **বলা** **হয়েছে**
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মদ, জুয়া ও বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন। ’ (বায়হাকি, হাদিস: ৪৫০৩; মিশকাত, হাদিস: ৪৩০৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, ‘পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়ায় অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদাতা ও মদ্যপায়ী জান্নাতে যাবে না। ’ (দারেমি, হাদিস: ৩৬৫৩; মিশকাত, হাদিস: ৩৪৮৬)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা.) যখন (মক্কা) এলেন, তখন কাবাঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা কাবা ঘরের ভেতরে মূর্তি ছিল। তিনি নির্দেশ দিলে মূর্তিগুলো বের করে ফেলা হয়। (এক পর্যায়ে) ইবরাহিম ও ইসমাইল (আ.)-এর প্রতিকৃতি বের করে আনা হয়। উভয় প্রতিকৃতির হাতে জুয়া খেলার তীর ছিল। তখন নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ! ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তারা জানে যে, [ইবরাহিম ও ইসমাইল (আ.)] তীর দিয়ে অংশ নির্ধারণের ভাগ্য পরীক্ষা কখনো করেননি। এরপর নবী (সা.) কাবাঘরে প্রবেশ করেন এবং ঘরের চারদিকে তাকবির বলেন। তবে ঘরের ভেতরে সালাত আদায় করেননি। (বুখারি, হাদিস: ১৫০৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ‘বলা হতো, উটের জুয়াড়িরা কোথায়? তখন দশজন প্রতিযোগী একত্রিত হতো এবং জুয়ার উটটির ক্রয়মূল্য হিসেবে দশটি উটশাবক নির্ধারণ করতো। তারা

জুম্মার পাত্রে তীর স্থাপন করে সেটিকে চক্কর দেয়াতো, তাতে একজন বাদ পড়ে নয়জন অবশিষ্ট থাকতো। এভাবে প্রতি চক্করে একজন করে বাদ পড়ে শেষে মাত্র একজন অবশিষ্ট থাকতো এবং সে বিজয়ী হিসেবে তার শাবকসহ অন্যদের নয়টি শাবকও লাভ করতো। এতে নয়জনের প্রত্যেকে একটি করে শাবক লোকসান দিতো। এটাও এক প্রকার জুম্মা। ’ (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নম্বর: ১২৭১)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, ‘তীর নিষ্ক্ষেপে বাজিধরা জুম্মার অন্তর্ভুক্ত। ’ (ফাতহুল কাদির, হাদিস: ১২৭২)

ফুদাইল ইবনে মুসলিম (রহ.) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, ‘আলী (রা.) বাবুল কাসর থেকে বের হলে তিনি দাবা-পাশা খেলোয়াড়দের দেখতে পান। তিনি তাদের কাছে গিয়ে তাদের ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আটক রাখেন। তাদের মধ্যে কতককে তিনি দুপুর পর্যন্ত আটক রাখেন। (বর্ণনাকারী বলেন, যারা অর্থের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে খেলেছিল, তিনি তাদের রাত পর্যন্ত আটক রাখেন, আর যারা এমনি খেলেছিল তাদেরকে দুপুর পর্যন্ত আটক রাখেন।) তিনি নির্দেশ দিতেন, লোকজন যেন তাদের সালাম না দেয়। ’ (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস: ১২৮০)

জুম্মা-বাজি থেকে প্রাপ্ত সবকিছু হারাম
সব ধরনের জুম্মা-বাজি ইসলামে অবৈধ। জুম্মা-বাজি থেকে প্রাপ্ত সবকিছু হারাম। হারাম ভোগ করে ইবাদত-বন্দেগি করলে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন না। তাই মুসলমান হিসেবে সব ধরনের জুম্মা-বাজি থেকে দূরে থাকা আবশ্যিক।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, প্রত্যন্ত গ্রামেও বসছে জুম্মার আসর। কৃষক, তরুণ, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থীরা জড়িয়ে পড়ছেন মরণনেশা জুম্মায়। এসব আসরে উড়ছে লাখ লাখ টাকা। মাদকের মতোই জুম্মার গ্রাস এখন দৃশ্যমান। এমতাবস্থায় অনৈতিক এসব কর্মকাণ্ড বন্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়াকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

জাহেলী আরবে নিয়ম ছিল যে, তারা উট যবহ করত। অতঃপর তা ২৮ বা ১০ ভাগ করত। অতঃপর তাতে তীরের মাধ্যমে লটারী করত। কোন তীর অংশহীন থাকত। কোন তীরে দুই বা তিন অংশ চিহ্ন দেওয়া থাকত। অতঃপর সেগুলি একটা পাত্রে রেখে নাড়াচাড়া করে সেখান থেকে এক একটা তীর বের করে নিতে বলা হ’ত। ফলে যার তীরে বেশী উঠত, সে বেশী অংশ নিত। আর যার তীর অংশবিহীন থাকত, সে খালি হাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে ফিরে যেত (মিছবাহুল লুগাত)।

এভাবে তীর দ্বারা গোশতের অংশ বণ্টন করা থেকেই **البايس** হয়েছে। অর্থ **بالقِداح** তীরের মাধ্যমে জুম্মা খেলুড়ে বা জুম্মাডী (কুরতুবী, বাফ্রাহ ২১৯)। বস্তুতঃ জুম্মার মাধ্যমে প্রতারণা করে অন্যের মাল সহজে হাছিল করা হয় বলে একে ‘মাইসির’ (**الميسر**) বলা হয়।

সাগ্গিদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, জাহেলী যুগে উটের গোশতের ভাগ একটি বা দু’টি বকরীর বিনিময়ে বিক্রি হ’ত। যুহরী আ’রাজ থেকে বর্ণনা করেন যে, মাল ও ফলের ভাগও মানুষ ক্রয় করত ভাগ্য নির্ধারণী তীর নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে’ (তাকসীর ইবনু কাছীর)। ইমাম মালেক (রহঃ) সাগ্গিদ ইবনুল

মুসাইয়িব হতে বর্ণনা করেন, رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (ছাঃ) গোশতের বিনিময়ে পশু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [12] ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ‘মাইসির’ দু’ধরনের। একটি হ’ল খেলা-ধুলা (اللهو)। অন্যটি হ’ল, জুয়া (الفمار)। খেলা-ধুলার মাইসির হ’ল, নারদ (পাশা খেলা), শাতরাজ (দাবা খেলা) ও সবরকমের খেলা-ধুলা। আর জুয়ার মাইসির হ’ল, মানুষ যেসব বিষয়ে বাজি ধরে ও জুয়া খেলে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, শতরাজ বা দাবা খেলা মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত (কুরতুবী, ইবনু কাছীর)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَانَ مَيْسِرَ فَكَانَ مَيْسِرَ يَدُهُ فِي لَحْمٍ ‘যে ব্যক্তি নারদশীর (পাশা) খেলল, সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে নিজের হাত ডুবালো’। [13] তিনি বলেন, مَنْ لَعِبَ بِاللَّزْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ‘যে ব্যক্তি নারদশীর খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করল’। [14]

উপরোক্ত খেলা দু’টি পারস্য দেশীয়। যা আরবদের মধ্যে চালু হয়। যাতে জুয়া মিশ্রিত ছিল। ‘মাইসির’ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ হল জুয়া। যার মাধ্যমে অর্থের লোভে মানুষ ধ্বংসে নিষ্কিণ্ত হয়। এই সাথে অনর্থক খেলা-ধুলাকেও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, খেলা-ধুলা বিষয়ে শরী‘আতের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ:

(১) **হারাম :** (ক) যে সম্পর্কে শরী‘আতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন- দাবা, পাশা ইত্যাদি (খ) যে খেলায় প্রাণীর ছবি, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা থাকে (গ) যে খেলা ঝগড়া-বিবাদ ও নোংরামিতে প্ররোচিত করে (ঘ) যে খেলায় অহেতুক অর্থের ও সময়ের অপচয় হয়।

(২) **জায়েয :** (ক) সৈনিকদের কুচ-কাওয়াজ, অস্ত্র চালনা, তীর নিষ্ক্ষেপ ইত্যাদি। [15] (খ) সাতার কাটা। [16]

(৩) **শর্তাধীনে জায়েয :** (ক) যদি ঐ খেলার সাথে জুয়া যুক্ত না থাকে (খ) যদি ঐ খেলা কোন ফরয কাজে বাধা না হয়। যেমন ছালাত, ছিয়াম প্রভৃতি (গ) যদি ঐ খেলা কোন ওয়াজিব কাজে বাধা না হয়। যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য, পারিবারিক দায়িত্ব পালন, লেখা-পড়া ও স্তানার্ন প্রভৃতি (ঘ) যদি ঐ খেলায় কোন অপব্যয় না থাকে (ঙ) যদি ঐ খেলায় অধিক সময়ের অপচয় না হয় (চ) যদি ঐ খেলা ইসলামী শালীনতা বিরোধী না হয়। যেমন হাটুর উপরে কাপড় তোলা, মেয়েদের প্রকাশ্যে খেলা করা ইত্যাদি।

১৭/৩৬)।

৩. النَّصْبُ একবচনে النَّصْبُ ‘নিদর্শন হিসাবে দাঁড় করানো কোন ঝান্ডা বা স্তম্ভ’ (মিছবাহ)। একবচনে هُتِفَ النَّصْبُ হ’তে পারে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, وَمَا دُبِحَ عَلَى النَّصْبِ ‘যা বেদীতে যবহ করা হয়’ (মায়েদাহ ৩)। ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, আব্বা প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন, هِيَ جَارَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَ فَرَايِنَهُمْ يَذْبَحُونَ هِيَ جَارَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَ هِيَ جَارَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَ এটি হ’ল সেই সব পাথর, যেখানে জাহেলী যুগের আরবরা পশু কুরবানী করত (ইবনু কাছীর)। ইবনু জুরায়েজ বলেন, লোকেরা মক্কায় এগুলি যবহ করত। অতঃপর বায়তুল্লাহর সামনে এগুলির রক্ত ছিটিয়ে দিত ও গোশত বেদীর মাথায় রাখত। এ সময় কা’বার চারদিকে ৩৬০টি এরূপ বেদী ছিল (কুরতুবী, ইবনু কাছীর)। এগুলির মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করত।

ইসলাম আসার পর এগুলিকে হারাম ঘোষণা। যদিও যবহের সময় তার উপরে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় (ইবনু কাছীর)। কেননা এর ফলে ঐ পাথরকে সম্মান করা হয় (কুরতুবী)। যা স্থানপূজার শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন পীর-আউলিয়ার কবরে ‘হাজত’ দেওয়ার নামে যেসব পশু ‘বিসমিল্লাহ’ বলে যবহ করা হয়, তা উক্ত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যা স্পষ্টভাবে হারাম। একইভাবে শহীদ বেদী, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি যেখানেই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. **الْأَزْلَامُ** একবচনে **زُلْمٌ** বা **زُلْمٌ** অর্থ পাথনা বিহীন তীর, ভাগ্য নির্ধারনী তীর। এখানে জুয়ার তীর বা শর। যার মাধ্যমে জাহেলী যুগের আরবরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করত। ইবনু কাছীর বলেন, আরবদের নিকট ‘আযলাম’ ছিল দু’ধরনের। একটি ছিল ভাল-মন্দ নির্ধারণ করার জন্য। অন্যটি ছিল জুয়া। অত্র আয়াতে জুয়াকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে ভাল-মন্দ নির্ধারণে আল্লাহর শুভ ইঙ্গিত কামনা করে ছালাতুল ইস্তিখারাহ আদায়ের নির্দেশ এসেছে হাদীছে। [18] ফলে উভয় অবস্থায় ‘আযলাম’ নিষিদ্ধ করা হ’ল।

জাহেলী যুগে ‘আযলাম’ ছিল তিন ধরনের। যেমন একটি তীরে লেখা থাকত **أَفْعَلْ** ‘তুমি কর’। একটিতে লেখা থাকত **لَا تَفْعَلْ** ‘করো না’। আরেকটিতে কিছুই লেখা থাকত না। অতঃপর যে ব্যক্তি যেটা তুলত, সেটাকেই সে আল্লাহর নির্দেশ মনে করত। কিন্তু যখন খালিটা হাতে উঠত, তখন সে পুনরায় লটারি করত। যতক্ষণ না আদেশ বা নিষেধের তীর হাতে আসত (ইবনু কাছীর)।

বর্তমান যুগে পাথির মাধ্যমে বা রাশি গণনার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। কেউ শান্তির প্রতীক মনে করে পায়রা উড়িয়ে শুভ কামনা করেন। কেউ বিশেষ কোন দিন বা সময়কে শুভ ও অশুভ গণ্য করেন। কেউ মৃত পীরের খুশী ও নাখুশীকে মঙ্গল বা অমঙ্গলের কারণ বলে ধারণা করেন। এসবই ‘আযলামের’ অন্তর্ভুক্ত যা নিষিদ্ধ এবং স্পষ্টভাবে শিরক

প্রতিকার ব্যবস্থা :

নৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে সাথে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

(১) সৎ ও আদর্শবান যুবসংগঠন বা ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়া। যারা সর্বদা সাথীদের ও অন্যান্যদের মধ্যে মাদক বিরোধী চেতনা জাগরুক রাখবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রচার অব্যাহত রাখবে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক ও ধূমপানের বিরুদ্ধে পাঠ দান করা এবং শিক্ষা সিলেবাসে কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতিসহ পৃথক অধ্যায় সংযোজন করা।

(৩) চিকিৎসকগণ তাদের রোগীদের কাছে মাদক ও ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরলে তা দ্রুত ফলদান করে এবং জনগণ দ্রুত এ বদভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে।

(৪) আলেম ও খতীবগণ যদি কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে তাদের শ্রোতা ও মুছল্লীদের সম্মুখে মাদক ও ধূমপানের অপকারিতা ও পরকালীন শাস্তির কথা তুলে ধরেন, তাহ'লে দ্রুত সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। যা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রশাসনের চাইতে সহজে এবং দ্রুত ফল দান করে থাকে।

(৫) আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশন থেকে সন্তানদের বাঁচানোর জন্য মোবাইল, কম্পিউটার, টিভির নীল ছবি থেকে তওবা করতে হবে। নিজের চোখ ও কানকে সর্বাগ্রে মুসলমান বানাতে হবে। যাতে ঐ দু'টি খোলা জানালা দিয়ে মনের গহীনে কোন নোংরা বস্তু প্রবেশ না করে। যা যেকোন সময়ে মানুষের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার ও সমাজনেতাদেরকে এদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেন তরুণ সমাজ বিপথে না যায়।

5)ভিন্ন ধর্মের প্রতি সহনশীলতা

অনেক সমালোচকের মন্তব্য, ইসলাম ভিন্ন ধর্ম পালনের সুযোগ দেয় না; অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সহ্য করে না। এমন ভুল বিশ্বাস ও ধারণা থেকে তারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইসলামি বিধিবিধান এবং ইসলামের ধারক-বাহকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করে। এ ক্ষেত্রে অনেকের পড়াশোনা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বেশ স্পষ্ট। তাদের বেশির ভাগ মুক্তমনা কিংবা বিজ্ঞানমনস্ক ও উদার পরিচয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে ইসলাম বিরোধিতা করে। তারা যৌক্তিক কোনো সমালোচনা করে না, তারা করে বিরোধিতা। দেখুন, ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে, ‘ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।’ –সূরা বাকারা : ২৫৬

ইসলাম কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে পারে না। তবে এর অর্থ এই নয়, সব ধর্ম সঠিক। যেকোনো ধর্ম অনুশীলন করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালে মুক্তি মিলবে। এ বিষয়ে আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ইসলামই প্রকৃত ধর্ম।’ –সূরা আলে ইমরান : ১৯

কোরআনে কারিমের অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘যারা ইসলাম ছাড়া ভিন্ন ধর্ম অনুসন্ধান করবে তাদের ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না।’ –সূরা আলে ইমরান : ৮৫

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোরআনে উল্লিখিত এসব বক্তব্য স্ববিরোধী। কারণ ভিন্ন ধর্মগুলো বাতিল হলে ইসলাম সেসব ধর্ম অনুশীলনের সুযোগ কেন দেবে? ভিন্ন ধর্ম পালনের সুযোগ ইসলাম সত্যিই দিয়ে থাকলে তা বাতিল গণ্য হবে কেন? এর জবাব হলো, আল্লাহ মানবজাতির জন্য পৃথিবীকে পরীক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ‘তিনি তোমাদের পালানুগমে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন তোমাদের কার্যকলাপ পরীক্ষার জন্য।’ –সূরা আরাফ : ১৬৯

পরীক্ষা কেন্দ্রে সঠিক উত্তর দানকারী ও ভুল উত্তর দানকারী সবারই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে, সবাই পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন। দুনিয়াতে সঠিক ও বাতিল ধর্ম উভয়ই অনুসরণকারীদের অনুশীলনে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতাপেয়ে কেউ ভুল জবাব লিখলে পরীক্ষকের কাছে তা

গ্রহণযোগ্য হয় না। একইভাবে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পেয়ে যারা ব্রাহ্ম ধর্ম পালন করবে তাদের এই ধর্মকর্মও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবার প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা দিলে কেউ ইসলাম গ্রহণের পর সে ধর্মের বিরোধিতা করলে তাকে দণ্ড দেওয়া হয় কেন? তাকে ইসলামি অনুশাসন পালনের কিংবা লংঘনের স্বাধীনতা দেয়নি কেন? এরও জবাব স্পষ্ট, অমুসলিমদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা, মুসলমানের জন্য ইসলামি অনুশাসন পালন বা লংঘনের স্বাধীনতা এক নয়। প্রথমটি হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা, এটি সবার জন্য সংরক্ষিত। পরের বিষয়টি নিজ ধর্মের অনুশাসন পালন বা লংঘনের স্বাধীনতা এটা ইসলাম কাউকে প্রদান করেনি। এ কারণে কোনো লোক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়ার দাবি করবে আবার ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

আগেই বলা হয়েছে, দুনিয়ায় বিশেষ পরীক্ষার কারণে সব ধর্মাবলম্বীকে ইসলাম সহনশীলতার দৃষ্টিতে দেখে। বিধর্মীদের তাদের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এ কারণে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি ইসলাম শ্রদ্ধাশীল। তথাপি সমাজে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। এসব নির্দেশনার অন্যতম হলো- কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ করে ইসলামে দীক্ষিত করার কোনো বিধান নেই। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। মুসলিম সমাজে অমুসলিমরা নিজেদের পরিমণ্ডলে ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করবে। তবে অমুসলিমদের যেসব রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম পালনের অংশ, সেগুলোতে মুসলিমদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

ইসলামের নির্দেশনা হলো দেশ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় সবাই সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করবে। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর সেখানে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনেক পণ্ডিত স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের পাঁচ মাস পর মদিনা রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। সনদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবার আদান-প্রদান সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে পরিচালনা করতে কোনো বাধা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) অনেকবার ইহুদিদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং যথাসময়ে তা পরিশোধ করে দিয়েছেন। যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’ -সহিহ বোখারি : ২৯৯৫

পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা ইসলামি সমাজব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এটি মুসলিম-অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও

সুন্নত। নবী করিম (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ইমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন।

সব ধর্মের মানুষ প্রতিবেশী হতে পারে। প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি সদয় আচরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শনে কোনো প্রকার ত্রুটি করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষায় ইসলাম অত্যন্ত তৎপর। আত্মীয় অমুসলিম হলেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে বসবাস করবে সদ্ভাবে।’ –সূরা লোকমান : ১৫

এভাবে সব মানুষের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। কারণ মানুষ হিসেবে সবাই সমান। আল্লাহ সব মানুষকে সম্মানিত করেছেন। ইসলামের শাস্ত্র এই শিক্ষার আলোকে বলা যায়, মুসলিম সমাজে উল্লিখিত দায়িত্ব সচেতনতা, কর্তব্যবোধ আগ্রহ ও বাস্তবায়িত হলে– ইসলামের সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শ

মুসলিম খ্রিস্টান ইয়াহুদি হিন্দু ও বৌদ্ধ সবাই মানুষ হিসেবে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত। হজরত আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালামের সন্তান হিসেবে আল্লাহর কাছে সব মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সমান। কোনো ধর্মই কারো ওপর জোর-জবরদস্তিকে সমর্থন করে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের আদর্শ সুমহান। অমুসলিমদের প্রতি বিশ্বনবির আচরণ ও মানসিকতায় তা ফুটে ওঠেছে।

সব ধর্মের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেছে ইসলাম। ধর্ম পালনে কেউ কাউকে বাধা দেবে না। অন্য ধর্ম নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা যাবে না মর্মেও কোরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

‘আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা (মূর্তিপূজক) ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে।’ (সূরা আনয়াম : ১০৮)

মুসলিম ব্যক্তির প্রতিবেশী যদি অমুসলিম হয়, তার অধিকারের প্রতিও খেয়াল রাখা জরুরি। এটিও প্রতিবেশীর হকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা–

‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেননি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত ৮)

বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে তা সুস্পষ্ট। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে–

‘হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের আদিপিতাও এক। একজন আরব একজন অনারব থেকে কোনো মতেই শ্রেষ্ঠ নয়। তেমনি একজন আরবের ওপরে একজন অনারবেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। একজন সাদা চামড়ার মানুষ একজন কালো চামড়ার মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, আবার কালোও সাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে বিচার্য বিষয় হবে, কে তাকওয়া তথা আল্লাহ ও বান্দার হক কতদূর আদায় করল। এর মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে তোমাদের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ধর্মপরায়ণ।’ (বায়হাকি)

সুতরাং বর্ণবাদ, পুঁজিবাদ, সামাজিক মর্যাদা, বংশ ইত্যাদি দ্বারা মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ ইত্যাদির বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাতে পরস্পরের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলি দ্বারা একে অপরের উপকার হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর এ ঘোষণা খুবই কার্যকরী। তিনি বলেছেন-

‘হে মানবজাতি! আমি পুরুষ ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার’। (সূরা আল-হজরাত : আয়াত ১৩)

মানুষ হিসেবে যার মর্যাদা যেমন; তার আচার-আচরণ ও পারিপাশ্বিকতাও তেমন। মহান আল্লাহ তাআলা যেখানে বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এত প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেছেন, সেখানে অমুসলিমদের প্রতি বিশ্বনবির আচরণ মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

৬) কুরআনে ভ্রাতৃত্ব

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামে ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব অপরিমিত। ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধিক আয়াত ও হাদিসে জোর ত্যাগ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।’ (সূরা হজরাত : আয়াত ১০)

একত্ববাদে বিশ্বাস তথা ঈমান আনয়ন করার পর মুমিনদেরকে যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তাগিদ দেয়া হয়েছে তা হলো একতাবদ্ধ হওয়া। সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেন, তোমরা সেইসব লোকদের মত হয়ো না, যাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।’ (সূরা আল-ইমরান : আয়াত ১০৫)। একজন বিশ্বাসী মুমিন নিজেকে মহান আল্লাহ তাআলার হুকুম সমীপে নির্দিষ্টায় অর্পণ করে দেয়। তেমনিভাবে অপর মুসলমানের জন্য তার মন উতলা থাকে। যাদের মধ্যে কোনো সময় পরিচয় ছিল না। একজন আরেকজনের ভাষাও বোঝে না- এমন দুইজন মুমিনও যখন ঈমানের দাবিতে একত্রিত হয়, তখন মুহূর্তেই যেন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে হৃদয়তা। ভাষার সীমাবদ্ধতা, দেশের ভিন্নতা এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

জন্মগতভাবে বিশ্বের সব মানুষ রক্তসম্পর্কীয় গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তারা সবাই মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম (আ.) এবং আদি মাতা বিবি হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এ কারণেই

জগতের সব মানুষ পরস্পর ভাই ভাই। একই পিতামাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে বংশপরম্পরায় মানুষ বিভিন্ন জাতি-ধর্ম, দল-মত, সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।’ (সূরা আল-হজুরাত, আয়াত: ১৩)

স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে ব্রাতৃত্বের ঘোষণা করে দিয়েছেন, সেই ব্রাতৃত্বকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। পারস্পরিক ব্রাতৃত্ব তো আরো কত কারণেই সৃষ্টি হতে পারে। একই দেশের নাগরিক, একই এলাকার বাসিন্দা, একই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, একই কর্মক্ষেত্রে কর্মরত ইত্যাদি কত কারণেই তা গড়ে ওঠে! তবে যত কিছুই হোক, কোরআনের ঘোষণার সঙ্গে আর কোনো কিছুর তুলনা চলে না। ঈমানি এই বন্ধন যে কেবল দুইজন ঈমানদার ব্যক্তির ঈমানের বিন্দুতে একত্রিত হওয়ার ফলে গড়ে ওঠে— বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। কোরআন ও হাদীসের নানা জায়গায় নানা আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে এ বন্ধনের গুরুত্বের কথা। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

تَحَابُّبُكُمْ أَفْشَا السَّلَامِ بَيْنَكُمْ تَحَابُّوْا. أَوْ لَا أَذْلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْوَهُ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى

তোমরা যতক্ষণ ঈমান না আনবে ততক্ষণ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ তোমরা মুমিনও হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে একটি কাজের কথা বলে দেব, যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমাদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৪

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারার আনসারগণ হিজরতকারী মুসলমানদের সঙ্গে ব্রাতৃত্বের যে নমুনা প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যিই বিরল। ঘরবাড়ি ফেলে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে শুধুই নিজেদের ঈমান রক্ষার তাগিদে দূর মদীনায যারা হিজরত করেছিলেন, তাদের একেকজনকে মদীনার একেকজন মুসলমানের ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রিয় নবীজির হাতে গড়ে ওঠা ব্রাতৃত্বের এ বন্ধনকে তারা এতটাই মাথা পেতে নিয়েছেন যে, তারা তাদের এ ভাইদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজেদের সম্পদে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছেন, এমনকি কেউ কেউ তো নিজের একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে নতুন এই ভাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে চেয়েছেন।

একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি ব্রাতৃত্বের হাত বাড়াবে, বিপদে-আপদে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে, কল্যাণ কামনা করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়াবে—এমন নির্দেশনা দেয় ইসলাম। ইসলামের বিধি-বিধানগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিছু কাজ করলে ব্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং এ সম্পর্ক আরো গভীর ও মজবুত হয়। ব্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলাম কিছু কাজকে নিষেধ করেছে আর কিছু কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করা

ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে বা উপহাস করলে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা, তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অন্য নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমান আনার পর কাউকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এ রকম কাজ থেকে তাওবা না করে তারাই অবিচারকারী।’ (সূরা হজুরাত, আয়াত : ১১)

পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ না করা

হিংসা আগুনের মতো সংকাজকে পুড়িয়ে ফেলে। এটি শত্রুতা বাড়ায়। রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা পরস্পর মনে বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, পরস্পর হিংসা কোরো না। একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ কোরো না, তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৬৫)

গালিগালাজ না করা

ইসলামে কাউকে গালিগালাজ করা হারাম। মহানবী (সা.) বলেন, ‘কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি এবং হত্যা করা কুফরি।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৪৪)

পরনিন্দা না করা

গীবত বা পরনিন্দা করা হারাম ও নিষিদ্ধ। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় কোরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হজুরাত, আয়াত : ১০)

সম্পর্ক ছিন্ন না করা

ইসলামী শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হারাম। রাসুল (সা.) বলেন, কোনো মুসলমানের জন্য তার ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা বৈধ হবে না। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৬৫)

সালাম দেওয়া

মুসলিমসমাজে পরস্পর অভিবাদনের মাধ্যম সালাম। সালাম রাসুল (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। রাসুল (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি বেশি সালাম বিনিময় করবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৯৮)

হাসিমুখে কথা বলা

নবীজি (সা.) সব সময় হাসিমুখে কথা বলতেন। হাসিমুখে কথা বলা সুন্নত। রাসূল (সা.) বলেন, ‘প্রত্যেক ভালো কাজ সদকাস্বরূপ। আর এটিও ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত যে তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাফাৎ করবে। (তিরমিজি, হাদিস : ১৯৭০)

দোয়া করা

দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। একজন মুসলমানের উচিত অন্য মুসলমানের জন্য কল্যাণের দোয়া করা। রাসূল (সা.) বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি যখন তার অন্য ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করে তখন ফেরেশতারা তার দোয়ায় আমিন বলে এবং তার জন্য অনুরূপ দোয়া করে।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫৩৪)

প্রয়োজন পূরণ করা

নবীজি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রয়োজন পূরণ করেন। যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের পার্থিব কষ্টগুলোর মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহর তায়ালা কেয়ামতের দিন তার ওপর থেকে একটি বড় কষ্ট দূর করে দেবেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৪২)

প্রকৃতপক্ষে ব্রাত্বের নিদর্শন হলো একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি দয়া, মায়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। তারা একে অপরের সুখে সুখী হবে এবং একে অপরের দুঃখে দুঃখী হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তুমি মুমিনদের তাদের পারস্পরিক দয়া প্রদর্শন, পারস্পরিক ভালোবাসা প্রদর্শন এবং পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের ব্যাপারে একই দেহের ন্যায় দেখবে। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে তখন এ জন্য সব দেহই নিদ্রাহীনতা ও স্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে।’ (বুখারি ও মুসলিম)

অতএব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মতনির্বিশেষে মানবজাতিকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এক দল বা গোত্র অন্য দল বা গোত্রের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ওপর আভিজাত্য প্রকাশ করবে না। সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সৌহার্দ্য ভাব স্থাপন করতে হবে। সমাজে মানুষে মানুষে যে সংঘাত-সহিংসতা, কলহ-বিগ্রহ, হানাহানি, খুনোখুনি, লুটতরাজ, হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা চলছে, এসব অনাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সবাইকে মানবতার ঐক্য ও ব্রাত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

৭)

ইসলাম পিতা-মাতার অধিকার আদায়ে বদ্ধপরিকর। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব পিতা-মাতা সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী। যেখানে কোনো স্বার্থ বা স্বার্থপরতার ছোঁয়া নেই। মায়া, মমতা, আদর, যত্ন ও নিখাদ ভালোবাসার এক অদ্বুত চক্রে আবর্তিত এ সম্পর্ক। বৃদ্ধ অবস্থায় যখন তারা অসহায় হয়ে পড়ে, তখন তাদের সর্বোচ্চ সেবা দেয়া সন্তানের দায়িত্ব। বৃদ্ধাশ্রম হলো মূলত বৃদ্ধ নারী-পুরুষের আবাসস্থল। গরিব, দুস্থ, সহায় সম্বলহীন, সন্তানহারা বৃদ্ধদের শেষ জীবনে বিশেষ সেবা প্রদান করার জন্য বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হলেও বর্তমানে এর বহুমাত্রিক

অপব্যবহার হচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের লজ্জাজনক প্রতিচ্ছবি এই বৃদ্ধাশ্রম। অশিক্ষিত, শিক্ষিত, চাকরিজীবী অনেক সন্তান নিজের কাছে পিতা-মাতা রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না। কখনো কখনো অবহেলা ও দুর্ব্যবহার করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেন যেন তারা নিজেরাই ভিন্ন কোনো ঠাই খুঁজে নেন। বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা ও নিউক্লিয়ার পারিবারিক ব্যবস্থার কারণে এ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

পিতা-মাতা শব্দটির মাঝে লুকিয়ে আছে অনেক মায়া-মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা। তারা এ পৃথিবীতে মানুষ আগমনের মাধ্যম। শত কষ্ট বেদনা উপেক্ষা করে যারা সন্তানের কল্যাণ কামনায় অহর্নিশ অতিবাহিত করেন। প্রতিটি সন্তান তাদের অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসায় বেড়ে ওঠে। যেকোনো পরিবারে শিশু, নারী, বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তির সবচেয়ে অসহায় ও দুর্বল। ইসলাম তাদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। বিশেষ করে পিতা-মাতার অধিকার আদায়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। সাময়িক ও চটকদার সমাধান ইসলামের কাম্য নয়। আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা অত্যাৱশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তাদের মধ্যে একজন অথবা তারা দু'জনই বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের উফু পর্যন্ত (বিরক্তিসূচক কোনো শব্দ) তোমরা বলবে না, তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩) অত্র আয়াতে সদাচরণের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ অবস্থাকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১- ইসলাম বয়স্কদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়। তারা যে প্রজন্মের উত্থান ও লালনপালন করেছে তার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার শোধ করার জন্য তাদের যত্ন নেওয়ার অধিকার রয়েছে বলে মনে করে।

২- সন্তানদের দায়িত্ব তাদের পিতামাতার যত্ন নেওয়া এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করা বাধ্যতামূলক। বয়স্ক ব্যক্তিদের সন্তান না থাকলে তাদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব সমাজের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

৩- এটিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে পাঠ্যের প্রাচুর্যের দ্বারা যা অন্যদের ভালো করতে উৎসাহিত করে, বিশেষ করে যারা অনেক বয়স্কদের মতো নিজেদের যত্ন নিতে পারে না। এটি একটি বিশ্বাসী আত্মাকে স্বেচ্ছায় ভালো করার জন্য স্বাভাবিকভাবে প্রচেষ্টা ব্যয় করতে অনুপ্রাণিত করে।

আপনার প্রশ্নের উত্তরে, বিশিষ্ট সৌদি মুসলিম লেকচারার এবং লেখক শেখ এম এস আল-মুনাজ্জিদ বলেছেন:

ইসলাম সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারের ধর্ম, একটি ধর্ম যা নিখুঁত নৈতিকতার শিক্ষা দেয় এবং খারাপ আচরণকে নিষেধ করে, এমন একটি ধর্ম যা মানুষকে তার মর্যাদা দেয় যদি সে আল্লাহর আইন মেনে চলে।

কোন সন্দেহ নেই যে ইসলাম বয়স্কদের একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে, কারণ এমন গ্রন্থ রয়েছে যা মুসলমানদেরকে তাদের সম্মান ও সম্মান করার আহ্বান জানায়। ইসলামে বয়স্কদের যত্ন নিম্নলিখিতগুলি সহ কয়েকটি ফোকাল পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে:

1. মানুষ একটি সম্মানিত প্রাণী এবং ইসলামে একটি সম্মানজনক মর্যাদা রয়েছে

আল্লাহ রাক্বুল আলামীন বলেন, “এবং আমি আদম সন্তানদেরকে অবশ্যই সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বহন করেছি এবং তাদেরকে হালাল উত্তম জিনিষ দিয়েছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (আল-ইসরা' 17:70) সুতরাং এই আয়াতের সাধারণ অর্থের ভিত্তিতে বয়স্ক ব্যক্তির আদমের সন্তান হিসেবে এই উচ্চ মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত।

2. মুসলিম সমাজ পারস্পরিক সহানুভূতি ও সংহতির সমাজ

মহান আল্লাহ বলেন, “মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরম দয়ালু” (আল-ফাতহ 48:29)

এবং তিনি আরো বলেন, মুমিনদের বর্ণনা করে, “অতঃপর তিনি তাদের একজন হয়ে গেলেন যারা (ইসলামী একেশ্বরবাদে) বিশ্বাস করেছিল এবং একে অপরকে অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সুপারিশ করেছিল এবং (এছাড়াও) একে অপরকে করুণা ও সহানুভূতির সুপারিশ করেছিল। তারা ডান দিকের লোক (অর্থাৎ জান্নাতের অধিবাসী)” (আল-বালাদ 90:17-18)

রাসূল (সাঃ) মুমিনদেরকে একটি দেহের মত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মুমিনদের পারস্পরিক ভালবাসা, করুণা ও সহানুভূতিতে তাদের দৃষ্টান্ত হল দেহের মত; যদি এর একটি অংশ অভিযোগ করে, তবে বাকি অংশ জাগ্রত থাকা এবং স্বরে আক্রান্ত হওয়ার জন্য তার সাথে যোগ দেয়” (মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে” (আল-বুখারি)

তিনি আরও বলেন, “যারা করুণাময় তাদের প্রতি পরম করুণাময় দয়া করেন। পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি করুণাময় হও যাতে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন” (তিরমিযী)

3. মুসলিম সমাজ হল সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমর্থনের একটি সমাজ

ইবনে আবি আদ-দুনিয়া ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আল্লাহর কাছে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সেই ব্যক্তি যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল। একজন মুসলমানকে খুশি করা, বা তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া, বা তার ঋণ পরিশোধ করা, অথবা তার থেকে ক্ষুধা নিবারণ করা। আমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যাওয়া আমার কাছে এই

মসজিদে [অর্থাৎ মদীনার মসজিদে] এক মাস ইতিকাক্ষ করার চেয়েও প্রিয়।... যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তার প্রয়োজন মেটাতে যায়। , যেদিন সকল পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবেন।"

4. বয়স্ক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা পায় যদি সে আল্লাহর আইন মেনে চলে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যুর আগে তার জন্য দোয়া না করে, কারণ যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তখন তার নেক আমল বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুই বৃদ্ধি পায় না। মুমিনের আয়ুষ্কাল কিন্তু ভালো।" (মুসলিম)

5. বয়স্কদের সম্মান করা এবং তাদের সম্মান করা মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহর মহিমা ঘোষণার একটি অংশ হল ধূসর চুলের মুসলিমকে সম্মান করা।" (আবু দাউদ)

6. মুসলিম সমাজ বয়স্কদের যত্ন নেওয়ার এই পদ্ধতি
ক পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

এটি ইসলামে বয়স্কদের যত্ন নেওয়ার একটি উপায় কারণ বাবা-মা সাধারণত বয়স্ক হন। পিতা-মাতাকে সম্মান করার আদেশের সাথে একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করার আদেশ এবং অনেক আয়াতে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করার নিষেধাঙ্গা রয়েছে।

যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন।" (আন-নিসা' 4:36)

এবং বলেন, "এবং আপনার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। এবং আপনি আপনার পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হন" (আল-ইসরা' 17:23)

এটি ইসলামে প্রবীণদের যত্নের অন্যতম রূপ। মুসলিম সমাজের সদস্যরা যখন তাদের পিতামাতার বন্ধুদের সাথে দেখা করে তখন তারা বয়স্কদের সমাজে অন্তর্ভুক্ত করতে সাহায্য করে এবং তারা যে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে তার অবসান ঘটাতে সাহায্য করে, যার ফলে বয়স্কদের মধ্য দিয়ে যাওয়া সামাজিক এবং মানসিক পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস পায়।

Au-21

১)বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছরের ওপরে শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ মানুষ মাদকাসক্ত। মাদকাসক্তদের মধ্যে ৮৫ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। না বুঝেই অনেক তরুণ এ পথে পা দিয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, মাদক সেবনের কারণে বিশ্বে প্রতি বছর ৮০ লাখ মানুষ এবং বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ মারা যায়। বাস্তবে এই সংখ্যা আরো বেশি। মাদকাসক্ত সন্তানের কারণে এক একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মাদকাসক্ত সন্তানকে নিয়ে পরিবারগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ছে। পথশিশুরাও আজ ভয়াবহ নেশায় আসক্ত হচ্ছে।

সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলায় দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েই চলেছে। কৌতূহল, পারিবারিক অশান্তি, বেকারত্ব, প্রেমে ব্যর্থতা, বন্ধুদের কুপ্রচারণা, অসং সঙ্গ, নানা রকম হতাশা ও আকাশ-সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার মূল কারণ। পারিবারিক বন্ধন ও ইসলামি মূল্যবোধ কম, এমন পরিবারের সদস্যরা অতি সামান্য কারণে মাদকদ্রব্যে অধিকতর আসক্ত হচ্ছে। নেশা মানুষের জীবনীশক্তি বিনষ্ট করে—এটা জেনেশুনেও মাদকাসক্তরা নেশার অন্ধকার জগতের মধ্যে থাকতে চায়। কিন্তু প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমান লোকেরা তো সর্বনাশা মাদকদ্রব্যের নেশায় মেতে উঠতে পারে না। কেননা হাদিস শরিফে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়েছে যে ‘মাদক ও ইমান একত্র হতে পারে না।’ (নাসাজি)

অথচ সমাজের বহু মেধাবী এবং সম্ভাবনাময় প্রতিভা মাদকের নেশার কবলে পড়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে সামাজিক অবক্ষয়ের পথ প্রদক্ষিণ করছে। সব ধরনের অপকর্ম, অশ্লীলতা থেকে একপর্যায়ে নীল ছবি তৈরি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি থেকে শুরু করে নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের লাঞ্চিতসহ নেশার টাকা সংগ্রহের প্রয়োজনে তাঁদের খুন পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করছে না। যেহেতু মাদকাসক্তি ও নেশাজাতীয় দ্রব্য মানবসমাজের জন্য মারাত্মক সর্বনাশ ও চিরতরে ধ্বংস ডেকে আনে, তাই ইসলামি শরিয়ত মাদকদ্রব্যকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে। পবিত্র কোরআনে মাদক সেবনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করে ইরশাদ হয়েছে, ‘ওহে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ণায়ক তির হচ্ছে ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কারসাজি। সুতরাং তোমরা এসব বর্জন করো—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।’ (সূরা-আল মায়িদা, আয়াত-৯০)

মাদক হলো এমন এক প্রকার অবৈধ ও বর্জনীয় বস্তু, যা গ্রহণ বা সেবন করলে আসক্ত ব্যক্তির এক বা একাধিক কার্যকলাপের অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তাই যেকোনো ধরনের পাপাচার ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে বিবেক বাধা দেয় না। মিথ্যা কথা বলা তাদের স্বাভাবিক বিষয়। কোনো ধরনের অপরাধবোধ তাদের স্পর্শ করে না। ধর্মের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ভালোবাসা কিংবা স্নেহ-মমতাও তাদের স্পর্শ করতে পারে না। মাদক সেবনকারীর দেহমন, চেতনা, মনন, প্রেষণা, আবেগ, বিচারবুদ্ধি সবই মাদকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

জীবনের ঠিকানা হয় ধ্বংসের সীমানায়। তাই নেশা ও মাদকাসক্তির ভয়াবহতা থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন, ‘নেশাজাতীয় যেকোনো দ্রব্যই মাদক, আর যাবতীয় মাদকই হারাম।’ (মুসলিম) অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, ‘যেসব পানীয়তে নেশা সৃষ্টি হয় তা সবই হারাম।’ (বুখারি ও মুসলিম)

মাদকাসক্তরা শুধু নিজেদের মেধা এবং জীবনীশক্তিই ধ্বংস করছে না, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলাও বিঘ্নিত করছে নানাভাবে। যেসব পরিবারের সদস্য নেশাগ্রস্ত হয়েছে, সেসব পরিবারের দুর্দশা অন্তহীন। জীবনবিধ্বংসী মরণনেশার কবলে পড়ে অসংখ্য তরুণের সম্ভাবনাময় জীবন নিঃশেষিত হচ্ছে। মাদকাসক্তি আসলে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি, বিচারক্ষমতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, আদর্শ সবকিছুকে খেয়ে ফেলে। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব অনিষ্টকারিতা ও অপকর্ম গুরুতর মহাপাপ।

মাদকাসক্তি মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে রাখে এবং সামাজিক অনাচারে লিপ্ত করে। এতে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। এ মর্মে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে বিরত রাখতে চায়, তবুও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?’ (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত-৯১) জনগণের সামাজিক আন্দোলন, গণসচেতনতা ও সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে মাদকাসক্তির মতো জঘন্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার করা সম্ভব। যার যার ঘরে পিতা-মাতা থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাড়া-মহল্লা বা এলাকায় মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে ঘৃণা প্রকাশের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মাদকদ্রব্যের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে নিয়মিত সভা-সমিতি, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিধিবিধান-সম্পর্কিত শিক্ষামূলক ক্লাস নিতে হবে। মাদকদ্রব্য উৎপাদন, চোরাচালান, ব্যবহার, বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রচলিত আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও কঠোর বিধান কার্যকর নিশ্চিত করতে হবে।

মাদক নিরাময়ে চাই পরিবারের আন্তরিকতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা। ধর্মভীরু পরিবারের পিতা-মাতাই সন্তানকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারেন। পিতা-মাতারা যদি তাঁদের কর্মব্যস্ত সময়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ নিজেদের সন্তানের জন্য বরাদ্দ রাখেন, তাদেরকে ইসলামি বিধিবিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেন, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করেন, তাদের জীবনের জটিল সমস্যাবলি সমাধানে সচেতন ও মনোযোগী হন, তাহলেই যুবসমাজে মাদকাসক্তির প্রতিরোধ বহুলাংশে সম্ভব। অভিভাবক ও মুরব্বিদের নিয়ে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় মাদক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করলে দেশ মাদকমুক্ত হবে নিঃসন্দেহে।

মাদকাসক্তি ত্যাগে আসক্তদের উৎসাহিত ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ দলমত-নির্বিশেষে দেশের তিন লাখ মসজিদের ইমাম বা ধর্মীয় নেতাদেরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন থেকে মাদকদ্রব্যকে উৎখাত এবং মাদকাসক্তি নির্মূল করতে হলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি দরকার মানুষের বিবেক ও মূল্যবোধের জাগরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন। এর জন্য প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মধ্যে গণসচেতনতা জাগাতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধ ও আন্দোলন, তার সূতিকাগার হবে পরিবার।

প্রতিটি পরিবারপ্রধানকে সন্তানদের অসৎ বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। সামাজিক অবক্ষয় রোধে পারিবারিক অনুশাসন, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে।

2)

ইসলামের ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, পুরুষদের অবশ্যই তাদের পেটের বোতাম থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে, যদিও এর মধ্যে নাভি এবং হাঁটু ঢেকে রাখা বা শুধুমাত্র তাদের মাঝখানে যা আছে তা নিয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করেন। মহিলাদের ঐতিহ্যগতভাবে তাদের হাত এবং মুখ ব্যতীত তাদের শরীরের বেশিরভাগ অংশ ঢেকে রাখতে উত্সাহিত করা হয়েছে।

মুসলিমদের জন্য পোশাক কোড: পুরুষদের জন্য শালীনতা এবং মহিলাদের জন্য হিজাব

ইসলাম হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ধর্মের প্রতিটি দিক ইসলাম আমাদের সৃষ্টিকর্তার দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে যাতে করে সুখী ও সুস্থ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিতে পারে জান্নাতে অনন্ত সুখের পথ সহজ করে। ধর্মে, ইসলাম কোরান ও সুন্নাহ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের পোশাক সংক্রান্ত কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে। একজন মুসলিম এবং একজন মুসলিম উভয়েরই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে ইসলামী শিক্ষাগুলো পালন করা আবশ্যিক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন: "এবং অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক সকল পাপ থেকে বিরত থাক।" (কুরআন, 6:120)

আজকাল বিনয় অন্য ধর্মে দুর্বলতা বা নিরাপত্তাহীনতার লক্ষণ বলে মনে হয় কিন্তু ইসলামে তা নয়। ধর্মে, ইসলাম বিনয়কে নিজের এবং অন্যদের প্রতি সম্মানের চিহ্ন হিসাবে দেখা হয়। ইসলাম পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য একটি পোশাক কোড সংজ্ঞায়িত করেছে, পোশাক কোড সংজ্ঞায়িত করার উদ্দেশ্য হল সমাজকে রক্ষা করা এবং শালীন পোশাক এবং আচরণের প্রচার করা। আল্লাহ সর্বশক্তিমান দ্বারা সংজ্ঞায়িত পোশাক কোড মুসলমানদের সম্মান, মর্যাদা এবং বিনয়ের সাথে তাদের জীবন পরিচালনা করার অনুমতি দেয়।

পোশাক পরিধান সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন: "হে আদম সন্তান! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার জন্য একটি পোশাক দিয়েছি এবং সেই সাথে তোমাদের জন্য একটি শোভা এবং তাকওয়ার পোশাকটি সর্বোত্তম" (কুরআন, 7:26)। পবিত্র কুরআনের এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, শালীন পোশাক পরা আমাদের সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ (সুবহানাহ ওয়া তায়ালা) মানুষকে সুন্দর পোশাক পরার এবং সুন্দর চেহারা পরার অনুমতি দিয়েছেন, কারণ এটি করা তাদের উপর আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করার একটি দিক। পবিত্র কোরআনে এই কথায় পোশাক পরিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে: "বলুন, 'আল্লাহর সাজসজ্জা, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য এনেছেন এবং পবিত্র ও পবিত্র জিনিসগুলোকে কে হারাম করেছে, যা আল্লাহ তাদের জন্য দিয়েছেন?' তারা পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য [হালাল] কিন্তু কেয়ামতের দিন তাদের জন্যই থাকবে।' এমনভাবে আমি আমার নিদর্শন বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা বোঝে।" (কুরআন, 7:32)

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা পোশাকের কারণ উল্লেখ করেছেন: শরীর ঢেকে রাখা এবং যা প্রকাশ্যে প্রকাশ করা উচিত নয় তা ঢেকে রাখা। শরীরকে সুন্দর করার জন্য যাতে ব্যক্তিটি আরও ভাল দেখায়। ইসলামিক পোশাক তার শালীনতার জন্য পরিচিত। একজন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছামত পোশাক পরিধান করার অনুমতি দেওয়া হয় যতক্ষণ না তারা শালীন হয় এবং কুরআন ও নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহর নির্দেশ মেনে নিতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়েরই উচিত পোশাক পরিধানে বিনয় প্রদর্শন করা। নারীদের এমন পোশাক পরা উচিত যাতে বোঝা যায় তারা

মুসলিম নারী। নারীদের পোশাক পরিধানের ব্যাপারে কুরআন নবী (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছে: “তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদের বলুন যেন তারা তাদের পোশাক নিজেদের চারপাশে জড়িয়ে নেয়। এটি আরও উপযুক্ত যাতে তারা ধার্মিক মহিলা হিসাবে পরিচিত হয় এবং হয়রানি না হয়।” (কুরআন, 33:59)

পুরুষদের পোশাকের মূল বিষয় হল তাদের পরিধান করা উচিত যে এটি হালাল এবং জায়েজ, তবে এটি হারাম, যেমন পুরুষদের জন্য রেশম, কারণ নবী (সাঃ) বলেছেন: “এই দুটি [সোনা এবং রেশম] পুরুষদের জন্য হারাম। আমার উম্মতের পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য বৈধ” (ইবনে মাজাহ)। অন্তরে অহংকার ও অহংকার সৃষ্টি করে এমন পোশাক পরিহার করতে হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অহংকার বশতঃ পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সেই পোশাক পরিধান করবেন এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে”। (ইবনে মাজাহ)

সংক্ষেপে, আমাদের মর্যাদা, সম্মান এবং শালীনতার সাথে যথাযথভাবে পোশাক পরা উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সঠিক পোশাক পরার তৌফিক দান করুন! আমীন

আল্লাহ তায়ালা বলেন: “হে আদম সন্তান, আমরা তোমাদেরকে পোশাক দান করেছি যা গোপন করা উচিত, এবং একটি সুন্দর অলঙ্করণ - এবং ন্যায়পরায়ণতার পোশাক, এটি সর্বোত্তম।” (আল-আরাফ ৭:২৬)

আল্লাহ এখানে পোশাকের কারণ উল্লেখ করেছেন: শরীর ঢেকে রাখা এবং যা প্রকাশ্যে প্রকাশ করা উচিত নয় তা গোপন করা এবং শরীরকে সুন্দর করা যাতে ব্যক্তিকে সুন্দর দেখায়। ইসলামিক পোশাক তার শালীনতার দ্বারা পরিচিত। একজন মুসলিমকে তার ইচ্ছামত পোশাক পরার অনুমতি দেওয়া হয় যতক্ষণ না সেগুলি শালীন, অমেধ্য থেকে মুক্ত, নিষিদ্ধ উপকরণ থেকে তৈরি নয় এবং পার্শ্ব নির্দেশিকা অনুসারে। টেক্সচুয়াল গাইডলাইন মানে এটাকে অবশ্যই কোরানের হুকুম ও

নবুওয়াতীয় ঐতিহ্য মেনে চলতে হবে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই তাদের পরিধানের পোশাকে শালীনতা প্রদর্শন করবে বলে আশা করা হয়। মহিলারা এমনভাবে পোশাক পরবেন যা দেখায় যে তারা বিশ্বাসী মহিলা। কুরআন নবীকে নির্দেশ দেয়, “আপনার স্ত্রীদের এবং আপনার কন্যাদের এবং মুমিনদের মহিলাদের বলুন যে তারা তাদের বাইরের পোশাক (জিলবাব) নিজেদের চারপাশে আবৃত করে। এটি আরও উপযুক্ত যাতে তারা ধার্মিক মহিলা হিসাবে পরিচিত হয় এবং হয়রানি না হয়।” (আল-আহযাব 33:59)

নারীদেরকেও বলা হয়েছে তাদের সূক্ষ্মতা প্রদর্শন না করতে। এর অর্থ এই যে পোশাকটি পরিধানকারীকে হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্য এবং একজনের বাহ্যিক চেহারা নিয়ে অহংকারে আচ্ছন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য। এটি এমন একটি উপায় যা মুসলিমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারে যা নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমানাকে সম্মান করে। এইভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের ধার্মিকতা, সততা, কঠোর পরিশ্রম এবং মূল্যবোধের জন্য বিচার করা হয়, নিষ্ক বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং ফ্যাশন সচেতনতার জন্য নয়। অনেক মুসলিম মহিলা সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে একটি ‘জিলবাব’ (মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখা বাইরের পোশাক), গ্লাভস সহ, এবং মুখের পর্দা (নিকাব) যা শুধুমাত্র চোখ দেখতে দেয়। এ সবই ইসলাম থেকে এসেছে। যাইহোক, এটি সব

বাধ্যতামূলক নয়। গ্লাভস এবং মুখের ওড়না বাধ্যবাধকতা নয় বরং সুপারিশ, এবং বেশিরভাগ মহিলারা সেগুলি না পরা বেছে নেন।

3)

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। আল-বায়ান

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও। তাইসিরুল

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। মুজিবুর রহমান

The believers are but brothers, so make settlement between your brothers. And fear Allah that you may receive mercy. Sahih International

১০. মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই(১); কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

(১) এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে। জারীর ইবন আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে “বাই’আত” নিয়েছেন। এক, সালাত কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।” [বুখারী: ৫৫]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফারী।’ [বুখারী: ৬০৪৪, মুসলিম: ৬৩] অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।” [মুসলিম: ২৫৬৪, কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী: ১৯২৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন: এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্চিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। [মুসনাদে আহমাদ: ১৬/২৯৭, ৭৭৫৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে

ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৪০]

অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংশেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ স্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। [বুখারী: ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬]

আরো একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিশালী করে থাকে। [বুখারী: ২৬৪৬, মুসলিম: ২৫৮৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করতে পারে না আবার তাকে ধ্বংসের মুখেও ঠেলে দিতে পারে না। [বুখারী: ২৪৪২, মুসলিম: ২৫৮০]

অন্য হাদীসে এসেছে, আল্লাহ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। [মুসলিম: ২৬৯৯] হাদীসে আরো এসেছে, কোন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোআ করে তখন ফেরেশতা বলে, আমীন। (কবুল কর।) আর তোমার জন্যও তদ্রূপ হোক। [মুসলিম: ২৭৩২]

(১০) সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর[১] এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। [২]

[১] এটি পূর্বের নির্দেশেরই তাকীদ স্বরূপ। অর্থাৎ, মুমিনরা যখন পরস্পর ভাই ভাই, তখন তাদের সবার মূল বস্তু হল ঈমান। অতএব, এই মূল বস্তুর দাবী হল, একই ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যেন আপোসে লড়ালড়ি না করে। বরং পরস্পর এক সাথে মিলে-জুলে, একে অপরের দুঃখে-সুখে শরীক হয়ে, পরস্পরকে ভালবেসে এবং একে অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী হয়ে থাকে। আর যদি কখনও ভুল বুঝাবুঝির ফলে তাদের মধ্যে দূরত্ব ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে তা দূর করে তাদের আপোসে পুনরায় সম্প্রীতি ও ব্রাতৃত্ব কায়েম করতে হবে। (যেহেতু এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ।) (আরো দেখুন, সূরা তাওবার ৭১নং আয়াতের টীকা)

[২] অর্থাৎ, সমস্ত বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। সম্ভবতঃ এর ফলে তোমরা আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়ে যাবে। সম্ভাবনা ও আশাব্যঞ্জক কথা সম্বোধিত (মানুষের) দিকে লক্ষ্য করে এ রকম বলা হয়েছে। কেননা, আল্লাহর রহমত ও করুণা তো ঈমানদার ও আল্লাহভীরুদের জন্য নিশ্চিত। পরবর্তী আয়াতগুলিতে মুসলিমদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

৪)

মুসলিম বিশ্বাসে ইসলাম চূড়ান্ত ধর্ম ও জীবনবিধান হলেও ইসলামী শরিয়ত সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ইসলাম মানুষকে অভিন্ন মানবিক অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ

হয়েছে, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক মানুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব খবর রাখেন।’ (সূরা হুজরাত, আয়াত : ১৩)

মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য : সব মানুষের প্রতি উদার ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে শিখিয়েছে। কেননা মানুষ হিসেবে সবাই সমান।

হাদিসে এসেছে, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় একটি লাশ নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির লাশ। তখন তিনি বলেন, ‘তা কি প্রাণ নয়?’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২৫০)

ধর্ম পালনে স্বাধীনতা : ইসলাম সব ধর্মের মানুষকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছে।

যদি না তা অন্য ধর্মের মানুষদের স্বাধীনতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘দ্বিনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ব্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহতে ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

’ (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬)

সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা : ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনো মানুষ সুবিচার থেকে বঞ্চিত না হয়—এ ব্যাপারে কোরআনের হুঁশিয়ারি হলো, ‘হে মুমিনরা, আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটাই আল্লাহভীতির নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৮)

নিরপরাধ মানুষের নিরাপত্তা : ইসলাম অপরাধী নয়—এমন সব মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তোমাদের স্বদেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করবেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

জান-মালের সুরক্ষা প্রদান : যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৯৯৫)

সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা : ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সাধারণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তবে শর্ত হলো এই সম্পর্ক ঈমান ও ইসলামের পথে অন্তরায় হতে পারবে না।

আল্লাহ বলেন, ‘আজ তোমাদের জন্য সব ভালো জিনিস হালাল করা হলো। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য (শর্তসাপেক্ষে) তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত : ৫)

বিতর্কে সংবেদনশীল থাকা : ঈমান ও ইসলামের প্রয়োজনে কখনো অমুসলিমদের সঙ্গে বিতর্ক করতে হয়, তবে অবশ্যই ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা উত্তমপন্থা ছাড়া কিতাবীদের সঙ্গে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সঙ্গে করতে পারো, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একই এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।’ (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬)

জাতীয় স্বার্থে ঐক্য : রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পাঁচ মাস পর মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। যা ইতিহাসে সনদ নামে পরিচিত। সনদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যেমন: চুক্তির প্রথম ধারায় বলা হয়, ‘বনু আওফের ইহুদিরা মুসলমানের সঙ্গে মিলে একই উম্মত বিবেচিত হবে। ইহুদি ও মুসলিমরা নিজ নিজ দ্বিনের ওপর আমল করবে। বনু আউফ ছাড়া অন্য ইহুদিরাও একই রকম অধিকার লাভ করবে।’ আট নম্বর ধারায় বলা হয়, ‘চুক্তির অংশিদারদের জন্য মদিনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে।’ ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়, ‘ইয়াসরিবের ওপর হামলা হলে তা মোকাবেলায় পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং নিজ নিজ অংশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।’ (আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ২০০)

আল্লাহ সবাইকে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতা দান করুন।

5) same as sp-23->1

6) same as sp-23->3

7) প্রসঙ্গত, সুস্থতা প্রত্যেক মানুষের কাম্য। সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে চায় না—এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুস্থতা-অসুস্থতায় ভিত্তি করে মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মপরিধি নির্ধারিত হয়। রাসূল (সা.) বলেন, ‘দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিন অধিক কল্যাণকর এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। আর যা তোমাকে উপকৃত করবে, সেটিই কামনা করো।’ (মুসলিম, হাদিস : ২৬৬৪)

ইবাদতের জন্য শক্তি-সামর্থ্য

আমল-ইবাদতের জন্য কায়িক ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োজন। শারীরিক শক্তি ও কায়িক সামর্থ্য আল্লাহ তাআলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। হাদিস শরীফে রাসূল (সা.) পাঁচটি অমূল্য সম্পদ হারানোর আগে এগুলোর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। এর অন্যতম হচ্ছে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা।

তিনি বলেন—

পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিস আসার আগে গনিমতের অমূল্য সম্পদ হিসেবে মূল্যায়ন করো।
জীবনকে মৃত্যু আসার আগে। সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার আগে। অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার আগে।
যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে এবং সচ্ছলতাকে দরিদ্রতা আসার আগে।

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা : ৮/১২৭; সহিহুল জামে, হাদিস : ১০৭৭

স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ

ইসলামে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কে রয়েছে বিশদ আলোচনা। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও কোনো রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে গেলে এর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার প্রতিও রয়েছে জোরালো তাগিদ।

ইসলাম রোগ প্রতিরোধেও গুরুত্বারোপ করেছে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করেছে। এজন্য আমরা দেখতে পাই, যে বিষয়গুলোর কারণে মানুষের রোগ হয় ইসলাম আগেই সেগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলামে হালাল-হারাম খাবারের বিবরণ দেখলে তা সহজেই অনুমেয়। ওয়াহাব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৭০৩; তিরমিজি, হাদিস : ২৩৫০)

স্বাস্থ্য রক্ষায় ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। শরীরের যথেষ্ট ব্যবহার উচিত নয়। কোরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি শরিয়ত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যেমন গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি তা কার্যকরের ফলপ্রসূ উপায় বাতলে দিয়েছে। যেমন- নেশাজাতীয় দ্রব্য হারাম করা এবং পরিমিত আহার ও সময়ানুগ খাবার গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া। কাজেই স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সচেতন হওয়া মুসলমানদের ঈমান ও বিশ্বাসের দাবি।

দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া

কোনো কারণে মানুষ অসুস্থ হলে আল্লাহ তাকে তার অসুস্থতার কারণে সওয়াব ও পুণ্য দান করেন। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে অসুস্থ হলে অবশ্যই তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তা ছাড়া অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের চেয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সুস্থ থাকাকে ইসলাম অধিক উৎসাহিত করেছে।

নবী করিম (সা.) তার সাহাবিদের দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন—

আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার নিরাময়ের উপকরণ তিনি সৃষ্টি করেননি। *বুখারি, হাদিস : ৫৬৭৮*

পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি স্বভাব

সুস্থ দেহ ও মনের জন্য পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি গুণ আল্লাহতায়ালার পছন্দ করেন। অপরিচ্ছন্নতা ও এলোমেলো পরিবেশ রোগব্যাদি ছড়ায়। আর ধীরে ধীরে এর প্রভাব মন ও মস্তিষ্কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই মহানবী (সা.) এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করেছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘পাঁচটি বিষয় মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি ১. খতনা করা, ২. নাভির নিচের অবস্থিত লোম পরিষ্কার করা, ৩. গোঁফ কাটা, ৪. নখ কাটা, ৫. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৮৮৯)

এছাড়াও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রচুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি

- চুল কাটা ও নখ কেটে নেওয়ার সেরা দিন শুক্রবার।
- অযথা লোম দূর করতে শেভিং ক্রিম ব্যবহার করা জায়েয। অসুস্থতা ছড়িয়ে পড়ার জন্য অযথা চুল এবং নখ কবর দেওয়া **উচিত**।
- ক্রুগলি কাটা লম্বা হলে জায়েয। ...
- দাড়ি ছাটাই ইসলাম ধর্মমতে নিষিদ্ধ।

স্বাস্থ্য রক্ষায় হাঁটাহাঁটি

হাঁটাহাঁটি শরীরচর্চার অনবদ্য মাধ্যম। মহানবী (সা.) দ্রুত হাঁটতেন। আবার কখনো কখনো দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ‘আমি নবীজির চেয়ে দ্রুতগতিতে কাউকে হাঁটতে দেখিনি।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৪৮)

সুস্থ দেহের জন্য মানসিক প্রফুল্লতারও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাসূল (সা.) নিজেও অত্যন্ত সদালাপী ও হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। সাহাবায়ে কেবলম বলতেন, আমরা হজর (সা.)-এর চেয়ে হাসিখুশি আর কাউকে দেখিনি। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৬৪১)

নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস

পরিমিত বা নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস সুস্থ দেহের জন্য একান্ত অপরিহার্য। স্বল্প আহার ও অতিভোজন দুটাই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ খাদ্যাভ্যাস আমাদের অনুসরণীয় হতে পারে। যেমন তিনি খুব পরিমিত আহার করতেন। (বুখারি, হাদিস : ৫০৮১)

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি পেটের এক ভাগ খাদ্য, এক ভাগ পানীয়, আর এক ভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ফাঁকা রাখতেন। (তিরমিজি, হাদিস : ১৩৮১) আর স্বাস্থ্যকর আহার গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৪৩১)

সকালের ঘুমকে না বলুন

সকালের ঘুম সুস্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ব্যক্তিজীবন গঠনে বড় প্রতিবন্ধক। পবিত্র কোরআনে অনেকাংশে সূর্যোদয় ও অস্তের সময় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে বলা হয়েছে। এজন্য রাতের শুরুর অংশেই বিছানায় যাওয়ার বিকল্প নেই। চিকিৎসাসাশ্ত্র মতেও রাত্রি জাগরণ নানাবিধ জটিল রোগের উৎস।

ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

একদা রাসূল (সা.) আমার ঘরে এসে আমাকে ভোরবেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলেন, তখন আমাকে পা দিয়ে নাড়া দিলেন এবং বললেন, ‘মা মণি! ওঠো! তোমার রবের পক্ষ থেকে রিজিক গ্রহণ করো! অলসদের দলভুক্ত হয়ো না। কেননা আল্লাহ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রিজিক বন্টন করে থাকেন।

আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, হাদিস : ২৬১৬

কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা, শরীরের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং রোগবালাই হলে চিকিৎসা নেওয়া মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ মুমিন পার্থিব-অপার্থিব প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। আর তার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সওয়াব লাভে ধন্য হন।

Au-22

4)

সব মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। আদি পিতা-মাতা হজরত আদম-হাওয়া আঃ থেকে সবার উৎপত্তি। কিন্তু কালক্রমে মানুষ এই ব্রাত্বে ফাটল ধরিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন জাতি, বংশ, গোত্র ও বর্ণের ভিত্তিতে। অথচ মানবতার দাবি হচ্ছে বিশ্বজোড়া প্রেম-ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা।

ইসলামী ব্রাত্বের মানদণ্ড হলো তাওহিদ। মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরস্পরের গভীর যোগসূত্র ও ভালোবাসার বন্ধনের দাবি হচ্ছে, এক মুসলিম অপর মুসলিমের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। সে যে দেশের হোক, যে ভাষারই হোক। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ‘মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু-ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।’ (সূরা

হজুরাত-১০)

‘মুমিন নর-নারী সবাই একে অন্যের বন্ধু-সহযোগী। তারা সংকাজের আদেশ করে, অসংকাজে বাধা দেয়, নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা তাওবা-৭১)

অথও ব্রাহ্মের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মতো। যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়।’ (সহিহ বুখারি-৬০১১, সহিহ মুসলিম-২৫৮৬)

অন্য হাদিসে নবীজী সা: বলেছেন, মুমিন মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ, মুমিন মুমিনের ভাই। সে তার জমি সংরক্ষণ করে ও তার অনুপস্থিতিতে তাকে হিফাজত করে।’ (সুনানে আবু দাউদ-৯৪৮) নবীজী আরো ইরশাদ করেন, ‘মুমিনগণ পরস্পর একটি ইমারতস্বরূপ। যার এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে রাখে।’ এ সময় তিনি উভয় হাতের আঙুলগুলো জড়িয়ে দেখিয়েছিলেন। (সহিহ বুখারি-৫৬৮০)

ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো তাকওয়া ও কল্যাণের কাজে মুসলিমরা একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। নিজেদের মাঝে সম্পর্ক সৌহার্দ্য বজায় রাখবে। অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত থাকবে।

সমাজ জীবনে মানুষ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই পারস্পরিক সহানুভূতি, ব্রাহ্মত্ব, সমঝোতা প্রভৃতি সদাচরণ সমাজে অন্যায় ও জুলুমের অবসান ঘটায় এবং ক্রমান্বয়ে মানবসভ্যতাকে গতিশীল করে তোলে। তাই দেখা যায়, মানুষ যখন পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে অথও সমাজ গঠন করেছে। তখন তারা অগ্রগতি ও শান্তির উচ্চতর মার্গে পৌঁছে গেছে। আর যখনই বিভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই পতন হয়েছে অনিবার্য পরিণতি। ইতিহাসের পাতায় এ রূপ ঘটনা অসংখ্য।

কুরআন-হাদিসের উপর্যুক্ত নির্দেশনা যখন সব গ্রাম-শহরের বাস্তবায়িত হবে তখন সব ভূখণ্ড একত্রিত একটি সমাজের রূপ নেবে, যে সমাজের চোখ ব্যথা হলে পুরা দেহ ব্যথিত হয় যেমনটা নবীজী সা: বলেছেন। তখন কোনো অঞ্চল দুর্যোগ দুর্বিপাকে পড়লে ওমনি অন্যান্য অঞ্চল বিপদের মোকাবেলায় ছুটে আসবে।

একজন মুসলিমের অন্তরে ঈমান যত বেশি থাকবে, সে মুসলিমদের সমস্যাকে তত বেশি গুরুত্ব দেবে, ব্রাহ্মত্বের বন্ধনকে সে ততটাই গুরুত্বের সাথে নিজের মধ্যে ধারণ করবে। এই উদ্বিগ্ন-গুরুত্ব দেখে তার ঈমানের উষ্ণতা আন্দাজ করা যাবে। হজরত জাবের রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রাসূল সা:-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করব, জাকাত আদায় করব এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করব।’ (সহিহ বুখারি-৫৭, সহিহ মুসলিম-৫৬) রাসূলুল্লাহ সা: জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলিমদের একে অন্যের হক ও ব্রাহ্মত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখার জোর নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম মনে করে মানুষের বংশ-গোত্র, ধন-দৌলত কিছুই মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষ মানবতার বিরাত বাগিচার এক একটি ফুল।

ইসলামী অনুশাসন যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না বিধায় আজ সব দেশে সর্বত্র ব্রাহ্মত্বের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে। কারোক্ষেত্রে ব্রাহ্মত্বের অনুভূতি এতটাই হ্রাস হয়ে গেছে যে, এখন সে কোনো অঙ্গে ব্যথা পেলে মোটেই টের পায় না। যাকে প্যারালাইসিস আক্রান্ত হওয়া বলা চলে। ফলস্বরূপ মুসলিমদের

ওপর বস্তুবাদের বিজয় উল্লাস হচ্ছে। দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলিমরা অপমানিত লাঞ্চিত বঞ্চিত ও রক্তের হোলিখেলার শিকার হচ্ছে। সব কুফরি শক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছে, অথচ আফসোস! নিজেদের রক্ষায় আমরা এখনো এক হতে পারিনি। এ বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে পরিত্রাণে এবং নিজেদেরকে রক্তের হোলিখেলা থেকে বাঁচাতে সবার মাঝে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বীজ বপন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

ইসলামে অনৈক্য ও বিভেদের অবকাশ নেই। ইসলামে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাসীদের একতাবদ্ধ থাকা, ঐক্য সংহতি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি রক্ষা করা অপরিহার্য। এবং এমন সব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, যা উম্মাহর ঐক্য নষ্ট করে এবং সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরস্পর কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয়া হারাম ও কবিরা গুনাহ।

শান্তির ধর্ম ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা ও অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তাওহিদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ইমানের দাবি। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে ইমানের পরে মোমিনদের সবচেয়ে বেশি তাগিদ দেওয়া হয়েছে ঐক্যবদ্ধ থাকার। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহর রক্ষু (ইসলাম ও কোরআন) -কে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না।’

(সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩) ‘তোমরা সেসব লোকের মতো হয়ে না, যাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।’ (সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ১০৫)

আমাদের মনে রাখতে হবে, সব বিশ্বাসী মুমিন মিলে একই জাতি। ইসলামে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। এ সম্পর্কের ভিত্তি ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ তাওহিদ। যে কেউ তাওহিদের স্বীকৃতি দেবে, সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। এই ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।’ (সূরা-৪৯ হুজরাত, আয়াত: ১০) ‘এই যে তোমাদের জাতি, এ তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।’ (সূরা-৯ তওবা, আয়াত: ১২) বিশ্বাসী মুমিনদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম দয়াময় তাদের জন্য (পারস্পরিক) ঐক্য-সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন।’ (সূরা-১৯ মারইয়াম, আয়াত: ৯৬)

শান্তির ধর্ম ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা ও অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তাওহিদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ইমানের দাবি। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে ইমানের পরে মোমিনদের সবচেয়ে বেশি তাগিদ দেওয়া হয়েছে ঐক্যবদ্ধ থাকার

অনৈক্যের বিষয়ে সতর্ক করে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন, ‘নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমার ইবাদত করো। কিন্তু তারা নিজেদের দ্বীনে নিজেদের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে।’ (সূরা-২১ আশ্বিয়া, আয়াত: ৯২-৯৩) ‘নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমাকে ভয় করো। এরপর তারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রতিটি দল যে পথ

গ্রহণ করল, তাতেই মত্ত রইল।’ (সূরা-২৩ মুমিনুন, আয়াত: ৫২-৫৩) ‘আল্লাহর কাছে উন্মত্ত একটাই।’ (সূরা-১০ ইউনুস, আয়াত: ১৯)

বিজয় ও সফলতার জন্য তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্য ও সংহতি অতীব জরুরি। কোরআন মাজিদের ঘোষণা, ‘আল্লাহ ওই সব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর রাস্তায় ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।’ (সূরা-৬১ সফ, আয়াত: ৪) বিধানের ক্ষেত্রে নবীগণের শরিয়তেও ভিন্নতা ছিল, অথচ তাঁদের সবার দ্বীন ছিল এক; তাঁরা সবাই ছিলেন তাওহিদপন্থী। এখানেই ইসলাম অতুলনীয়। আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভেদ করো না।

স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে, তখন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ একে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ।...তোমরা তাদের মতো হয়ে না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং মতভেদ করেছিল, তাদের নিকট সুস্পষ্ট বিধানসমূহ পৌঁছার পর।’ (সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ১০২-১০৫)

ঐক্যের অর্থ ইমান ও ইসলামের সূত্রে একতাবদ্ধ থাকা। আল কোরআনের বাণী, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। পরস্পর বিবাদ করো না। তাহলে দুর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে।

আর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সূরা-৮ আনফাল, আয়াত: ৪৬) ‘মোমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।’ (সূরা-৪৯ হজুরাত, আয়াত: ১০)

ইমান ও ইসলামের সঙ্গে মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও ইখলাস। ঐক্যের জন্য চাই ত্যাগের মানসিকতা, সহনশীলতা, সদাচার ও উদারতা। যার সূত্র হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমরা মন্দ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো।

কারণ, ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার। তোমরা আড়ি পেতো না, গোপন দোষ অন্বেষণ করো না, স্বার্থের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ করো না, একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না...।’ (বুখারি: ৫১৪৩, মুসলিম: ২৫৬৩)

7)

শরীরকে রোগমুক্ত করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাই হলো স্বাস্থ্যসেবা। মহান আল্লাহই মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মালিক। কেউ যেমন জীবন দিতে পারে না, তেমন মৃত্যুও স্থগিত করতে পারে না। তবে স্বাস্থ্যসেবা নির্ধারিত মৃত্যুর সময় আসা পর্যন্ত জীবনকে সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর ও সচল রাখতে সাহায্য করে।

মানুষের চলাফেরা, জীবন-জীবিকা, ইবাদত বন্দেগিসহ সব কিছুই নির্ভর করে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর। শারীরিক সুস্থতা ছাড়া নামাজ, রোজা ও হজের মতো মৌলিক ইবাদত পালন করা সম্ভব নয়।

যাঁরা স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত আছেন, তাঁরা অতি মহৎ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ঔষধ প্রশাসন, উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

আর সব শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করছে। স্বাস্থ্যসেবার এই বৃহত্তর পরিসরে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে স্বাস্থ্যসেবায় মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতা আরো সুদৃঢ় হবে এবং মানুষ তাদের প্রশান্তির জায়গা খুঁজে পাবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অনন্য ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে।

এক. দায়িত্বসচেতন হওয়া : সব পেশাতেই নির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের বিনিময়ে বেতন-ভাতা বা পারিশ্রমিক পাওয়া যায়।

পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারলেই বেতন-ভাতা বা পারিশ্রমিক বৈধ হয়। এর মধ্যে যদি সেবা আদান-প্রদানের এবং মানুষের জীবন-মরণ সম্পর্কিত পেশা হয়, তাহলে পেশাদারি, দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো বেড়ে যায়। আরো সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার অপরিহার্যতা সৃষ্টি হয়। এ জন্যই একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে যোগ্য, দক্ষ, সহানুভূতিশীল, দায়িত্ববোধসম্পন্ন হতে হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে একনিষ্ঠ একজন নার্স ছিলেন রুফাইদা (রা.)।

তিনি যুদ্ধের ময়দানে নার্সের দায়িত্ব পালন করতেন। খন্দক যুদ্ধে আহত সাদ (রা.)-কে রুফাইদা (রা.)-এর সেবা প্রদানের বিষয়টি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। (আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ, হাদিস : ১১৫৮)

রুফাইদা (রা.) ছিলেন একজন আদর্শ স্বাস্থ্যকর্মী। সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ ও ক্লিনিক্যাল যোগ্যতা ও দক্ষতার অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর মধ্যে। তৎকালীন মদিনার অসুস্থদের সেবা করতেন তিনি। উম্মে আতিয়া (রা.) বলেন, ‘আমরা যুদ্ধের ময়দানে অসুস্থদের খোঁজখবর নিতাম আর আহতদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করতাম।’ (বুখারি, হাদিস : ৯৩৭)

দুই. কল্যাণকামী হওয়া : ‘দ্বিন মানেই হলো নসিহত বা কল্যাণকামিতা।’ (মুসলিম, হাদিস : ২০৫) আর সব মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতা হলো, সঠিক পথ ও কল্যাণকর কাজের দিকনির্দেশনা দেওয়া, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, প্রয়োজন পূরণ করা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা না করা, হিংসা পোষণ না করা। সবার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন এবং সব কাজে সেবার মানসিকতা জাগ্রত করা। স্বাস্থ্যসেবায় কল্যাণকামিতার এ বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হলে স্বাস্থ্যসেবাও দ্বিনি কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে।

তিন. অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করা : রোগব্যাধি মানুষের হাসি-আনন্দ স্তান করে দেয়। রোগীসহ পুরো পরিবার মানসিক কষ্টে পড়ে যায়। এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তার, এক

হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতাল দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। এর সঙ্গে আর্থিক সংকট থাকলে তাদের আরো ভেঙে পড়তে দেখা যায়। ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় মানুষ কে? আর আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দের আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় সে, যে অধিক পরোপকারী। আর আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমল হলো, কোনো মুসলমানের মনে খুশি প্রবেশ করানো, তার কোনো বিপদ দূর করা, তার কোনো ঋণ পরিশোধ করা অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। অন্য ভাইয়ের প্রয়োজনে হেঁটে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে (নববী) এক মাস ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম। (তাবারানি, হাদিস : ৮৬১)

চার. লোভ পরিহার করা : লোভ মানব চরিত্রের দুর্বল ও হীন বৈশিষ্ট্যের একটি। এর সাহায্যেই সৃষ্টি হয় অসৎ ও অবৈধ কাজের বিভিন্ন পন্থা। মানবিক গুণাবলি ভুলুর্নিত হয়ে অর্থ-সম্পদ উপার্জনই হয়ে উঠে জীবনের পেশা আর নেশা। ফলে সেবা প্রদান পরিণত হয় রক্ত চুষে নেওয়ার আখড়া। লোভীদের ব্যাপারে রাসুল (সা.) বলেন, যদি কোনো মানুষের এক উপত্যকা ভরা সোনা থাকে, তাহলে সে তার জন্য দুই উপত্যকা ভরা সোনা হওয়ার আশা করে। তার মুখ মাটি ছাড়া (মৃত্যু পর্যন্ত) আর কিছুতেই ভরে না। (বুখারি, হাদিস : ৬০৭৫)

মহান আল্লাহ বলেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সংগত নয়, তোমরা শিগগির তা জানতে পারবে।’ (সূরা তাকাসুর, আয়াত : ১-৩)

পাঁচ. প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া : পৃথিবীতে সবাই একে অন্যের সহযোগিতা নিয়ে বেঁচে থাকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহযোগী। সহযোগিতার আশায় মানুষ সেবা প্রদানকারীর দারস্থ হয়। সেবা প্রদানকারী ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিলে গ্রহীতা হয়তো বুঝতেই পারে না বা বুঝলেও অনেক সময় কিছু করার থাকে না। অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা, অননুমোদিত ওষুধ প্রেসক্রাইব, ওষুধ না দিয়ে বিল, অতিরিক্ত বিল, মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদান, পরীক্ষা না করে রিপোর্ট প্রদান, চিকিৎসার সুযোগে যৌন অসদাচরণ, অপ্রয়োজনে রোগীকে আইসোলেশনে রাখাসহ বিভিন্নভাবে সেবাগ্রহীতা প্রতারণার শিকার হয়ে থাকে। এসব প্রতারণায় পরকালে তো বটেই, অনেক সময় দুনিয়াতেই শাস্তি পেতে হয়। এগুলো কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (মুসলিম, হাদিস : ২৯৪)

পরিশেষে বলা যায়, স্বাস্থ্যসেবায় উল্লিখিত ধর্মীয় মূল্যবোধ বাস্তবায়িত হলে স্বাস্থ্যসেবা কল্যাণ আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে।

ম্যাক্সিমাম আন্সার গুলা যেহেতু একি টপিকস এ তাই সেগুলা রিপিট
করে আবার দেয়া হয়নি।

কষ্ট করে নিজের মত করে লিখবেন ।.....**Thank you**

Sumaiya Manisha